ওঁ তৎসৎ।

হিতৈষণা গ্রন্থাবলী—১০

বাল্যসখা

শ্রীভগবৎকথা

কলিকাতা,

৬।১ দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি (পূর্ব্বদ্বার) হইতে

শ্রীহরিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩১৯ সাল।

[মূল্য ।০ আনা মাত্র।

আত্মপরিচয়।

৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র, ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র, ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র, আদি ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অভিনব সংস্করণ সম্পাদক, অধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ, রাজা হরিশ্চন্দ্র, আর্য্য রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা, অভিব্যক্তিবাদ, ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি, আলাপ, আঁখিজল প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা, কলিকাতা জোড়াসাঁকো-নিবাসী শাণ্ডিল্যগোত্র শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি-এ কর্ত্তৃক বিরচিত শ্রীভগবৎকথা ১৮৩৪ শকে, ৫০১২ কলিগতাব্দে, ৮৩ ব্রাহ্ম সম্বতে মীনরাশিস্থ ভাস্করে, চৈত্র মাসে নবম দিবসে শনিবাসরে শুভ হিন্দোল পৌর্ণমাসী তিথিতে প্রকাশিত হইল।

কলিকাতা,

২১০।৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নব্যভারত-প্রেসে,

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৯

ওঁ

যিনি আমার হৃদয়ের দেবতা,

যিনি আমার প্রাণের আরাম,

তাঁহারই হস্তে ইহা

সমর্পিত হইল

দোল পূর্ণিমা
১৩১৯ সাল

ভূমিকা।

বাটীতে একটী দুর্ঘটনা ঘটিবার পর আমি দুইচারিটী শিশুকে ভগবানের বিষয় খুব সহজ ভাষায় ও সহজ ভাবে বুঝাইবার এবং খুব সহজ কথায় প্রার্থনা শিক্ষা দিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলাম। সেই সময়ে, এই দুইটী বিষয়ে খুব সহজ ভাষায় লিখিত কোন পুস্তক আছে কিনা অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। দেখিলাম যে ধর্ম্মবিষয়ে বয়স্ক বালক ও শিক্ষিত যুবকদিগের জন্য অনেক গ্রন্থ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আট দশ বৎসরের শিশুসন্তানের উপযুক্ত একখানিও প্রকৃত ধর্ম্মগ্রন্থ পাওয়া যায় না। অবশেষে ভগবানের আদেশ এবং শিশুদিগের হিতৈষণা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া এই অতীব কঠিন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইলাম। বর্ত্তমান গ্রন্থে ভগবানের বিষয় সাতটী কথায় শিশুবোধ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ইহা সাদরে গৃহীত হইলে প্রার্থনা শিক্ষা দিবার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার ইচ্ছা রহিল। যদি কোন পিতামাতা এই গ্রন্থ হইতে সন্তানদিগকে ঈশ্বরের বিষয়ে শিক্ষা দিবার সুবিধা প্রাপ্ত হয়েন তবেই আমার পরিশ্রম সার্থক। আর যদি কেহ প্রার্থনা পুস্তক লেখা সম্বন্ধে আমাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়েন, তবে তিনি প্রত্যেক বঙ্গবাসীর আশীর্ব্বাদভাজন হইবেন নিঃসন্দেহ।

আমার সকল জ্ঞান, সকল কর্ম্ম, সকল প্রীতি শ্রীভগবানেই চরিতার্থতা লাভ করুক।

জোড়াসাঁকো, কলিকাতা
৯ই চৈত্র ১৮৩৪ শক
২২শে মার্চ্চ ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ
শনিবার

শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

—ওঁ—

অনুক্রমণিকা

বিষয় পৃষ্ঠা।

বিষয় পৃষ্ঠা।

বিষয় পৃষ্ঠা।

বিষয় পৃষ্ঠা।

অথ অনুক্রমণিকা সমাপ্ত।

—ঃওঁঃ—

ওঁ তৎসৎ।

শ্রীভগবৎকথা।

তুমি এস।

অনন্ত শকতি তব
　　নাহি অন্ত দেখি তার।
ভূলোকে দ্যুলোকে সব
　　তুমি এক সারাৎসার॥

তোমারি মহিমা করে
　　ঘোষণা দাঁড়ায়ে যত।
মহান গগন তলে
　　চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ শত॥

প্রভাতের সূর্য্য জাগে
　　মঙ্গল তোমারি গানে।
তেমনি মধুর ডাকে
　　জাগাও আমার প্রাণে॥

মহান পুরাণ তুমি
　　অবাক হইয়া দেখি।

হেথা ক্ষুদ্র নর আমি—
অপরূপ রূপ একি ॥

জানি না কেমন করে
তোমায় ডাকিতে হবে।
তুমি না শেখালে পরে
কে আর শেখাবে ভবে ॥

ডাকিতে শিখেছি শুধু
এস এস এস বলে।
থাক হে পরাণ বঁধু
সকল হৃদয় ভরে ॥

—: ওঁ :—
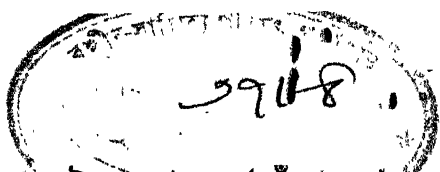
প্রথম কথা—ঈশ্বর আছেন (ওঁ সত্যং)।

অনেক দিন অবধি আমার ইচ্ছা ছিল যে তোমাদিগকে ভগবানের বিষয়ে দুই চারিটী কথা শোনাব এবং তাহার ফলে তোমাদেরও হৃদয়ে তাঁহাকে জানবার ইচ্ছা জাগিয়ে তুলব, আর আমার নিজেরও প্রাণ শীতল করব।

মুখবন্ধ

ঈশ্বর যে আছেন, সর্ব্বপ্রথম সেই বিষয়েই আমি তোমাদিগকে বোঝাতে চাই, কারণ পরে যা কিছু বলব, সে সমস্তই ঈশ্বর আছেন, এই সত্যের উপর নির্ভর করে। ঈশ্বর যদি না থাকেন, তাহলে তাঁহার বিষয়ে কোন কথা বলারই দরকার নেই।

আমরা সকলেই শুনে আসছি, উপদেশ পেয়েও আসছি যে, সুখেতে দুঃখেতে ঈশ্বরকে ডাকতে হয়, তাঁকে ভাল করে ডাকলে সকল বিষয়েই ভাল হয়। তোমরাও ধ্রুবের গল্প, প্রহ্লাদের গল্প এবং অন্যান্য সাধুদিগের অনেক কথা নিশ্চয়ই পড়েছ শুনেছ। সেই সমস্ত গল্প ও কথা পড়ে শুনে তোমাদেরও মনে নিশ্চয়ই একবার না একবার ইচ্ছা হয়েছে যে তোমরাও যেন সেই সকল সাধুদের মত ঈশ্বরকে ডাকতে পার।

সাধুদের কথা পড়ে বা শুনে দুএকবার মাত্র ঈশ্বরকে ডাকবার ইচ্ছা হলে তো চলবে না। তাঁকে ভাল করে জানতে হবে এবং জেনে সর্ব্বক্ষণ সকল কাজে তাঁকে ডাকতে হবে, তবে তো তোমরা ভক্ত সাধুদের মত হতে পারবে। তাঁকে না জানলে তোমরা কেমন করে তাঁকে সকল কাজে ডাকবে?

এখন বুঝলে যে আগে ঈশ্বরকে জানতে হবে। কিন্তু তাঁকে জানতে গেলেই সর্ব্বপ্রথম্ জানতে হবে যে তিনি আছেন।

বিশেষ অঙ্গদ্বারা বিশেষ বিষয় জানিতে হয়।

তোমরা চামড়ার চোখে তাঁকে দেখতে পাও না বটে, কিন্তু আমার কথাগুলি ভাল করে ধরে গেলেই বুঝতে পারবে যে ঈশ্বর আছেন। দেখ, এই পৃথিবীতেই আমরা সকল জিনিস সকল অঙ্গ দিয়ে জানতে পারিনে। এই যে গাছে, আকাশে, ফলে, ফুলে, পশুপক্ষীতে কত রকমের রং দেখা যায়, সেই রং দেখতে গেলে আমাদের চোখ খুলে থাকতে হবে। চোখ বন্ধ করলে রং দেখতে পাইনে—কান দিয়ে রং দেখা যায় না। সেই রকম কাণ দিয়ে গান শোনা যায়, কিন্তু চোখ দিয়ে কোন শব্দই শোনা যায় না। হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায়, অনুভব করা যায়, কিন্তু শব্দ শোনা বা রং দেখা যায় না। যে অঙ্গ যে কাজের জন্য হয়েছে, সেই অঙ্গ দ্বারা সেই কাজই হয়। এক অঙ্গের দ্বারা অন্য অঙ্গের কাজ করা যায় না। ঈশ্বরকে জানতে গেলে এই চামড়ার শরীরের দ্বারা জানতে পারবে না। তোমাদের যে বুদ্ধি আছে, সেই বুদ্ধি দ্বারাই তাঁকে জানতে হবে। বুদ্ধিই ঈশ্বরকে জানবার অঙ্গ। সেই বুদ্ধির সঙ্গে চামড়ার কোন সম্বন্ধ নেই।

ঈশ্বরকে জানিবার অঙ্গ বুদ্ধি।

একটুখানি স্থির হয়ে ভেবে দেখলেই, তোমাদের ভিতরে যে বুদ্ধি আছে, সেই বুদ্ধি বলে দেবে যে ঈশ্বর আছেন। মনে কর যে একটা পাত্রে কত-

নুন ও জলের দৃষ্টান্ত

কটা নুন আছে, সেই নুনের উপর কতকটা জল পড়ে গেল। তখন তোমরা আর নুনটুকু দেখতে পাচ্ছ না। কিন্তু দেখতে পাচ্ছ না বলেই কি নুনটুকু সেই পাত্রে নেই? নিশ্চয়ই আছে। তোমরা যদি সেই নুনগোলা জলের একটুখানি মুখে দাও, তাহলেই জানতে পারবে যে সেই জলের ভিতরে নুনটুকু আছে। আবার যদি সেই নুনটুকু চামড়ার চোখে দেখতে চাও, তাহলে তার জন্য উপযুক্ত উপায় ধরতে হবে। রৌদ্রে পাত্রটী রেখে জলটুকু শুকিয়ে ফেল, তখন নুনটুকু চামড়ার চোখে দেখতে পাবে। সেই রকম বুদ্ধি অবশ্য জানিয়ে দেবে যে ঈশ্বর আছেন। কিন্তু যদি সেই বুদ্ধিতে ঈশ্বরকে খুব স্পষ্ট দেখতে ইচ্ছা কর, তাহলে তার জন্য বিশেষ বিশেষ উপায় ধরতে হবে।

বাড়ীর কর্ত্তার দৃষ্টান্ত

এখন ভেবে দেখ যে তোমাদের বুদ্ধি বলে দেয় কি না যে ঈশ্বর আছেন। মনে কর যে তোমার একটী বাড়ী আছে। সেখানে তুমি না থাকলেও তোমার চাকরদাসীরা তোমার হুকুমমত কাজ করে যাচ্ছে। একদিন আমি যদি সেই বাড়ীতে গিয়ে দেখি যে চাকর-দাসীদের প্রত্যেকে আপনার আপনার নির্দ্দিষ্ট কাজ করে যাচ্ছে, তাহলে আমি বুদ্ধিতে বুঝে নেব কি না যে সেই বাড়ীর একজন কর্ত্তা আছেন, যাঁর কথামত চাকরদাসীরা নিয়মিত কাজ করছে? রেলের গাড়ী, ট্রাম গাড়ী প্রভৃতিকে চলতে দেখলে মনে হয় যে সেগুলি যেন আপনাপনি চলছে। কিন্তু বাস্তবিক কি তাই? একজন চালক চালায় তবে সেগুলি চলে।

সেই রকম যখন দেখি যে এই পৃথিবীর সকলই কেমন নিয়মিত রকমে চলছে, তখনই বুদ্ধি বলে দেয় যে এই নিয়মিতরূপে সকলকে চালাবার একজন চালক আছেন। এই সূর্য্যচন্দ্র প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে উঠছে, আবার নিয়মিত সময়ে ডুবে যায়; এই সূর্য্যচন্দ্রের ওঠানাবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রীষ্ম বর্ষা শীত বসন্ত প্রভৃতি ঋতু সকল নিয়মিত সময়ে উপস্থিত হয়ে জগতে কেমন সুখশান্তি দিচ্ছে। বর্ষাকালে আকাশের জল পেয়ে গাছপালা বাড়তে থাকে, আবার শরতের গরম পেয়ে ধান প্রভৃতি পাকতে আরম্ভ হয়; আবার বসন্ত কালের বাতাস পেয়ে গাছপালা আনন্দপুলকে নতুন নতুন ফুল পাতার জন্ম দেয়। এই যে জগতের সকল কাজই নিয়মিতভাবে অবিশ্রামে হয়ে যাচ্ছে, একজন কর্ত্তা ও নিয়ন্তা না থাকলে কি সেই সকল কাজ এমন নিয়মিতভাবে চলতে পারত?

জগতের নিয়ন্তা ঈশ্বর

তোমরা পড়েছ যে মাথার উপরে আকাশে ছোট ছোট হীরার টুকরার মত যে সকল নক্ষত্র ও তারা দেখা যায়, সেই সকল নক্ষত্রতারাগুলির প্রত্যেক-টীই এক একটী পৃথিবীর মত বড়—কোন কোনটী আবার পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড়। আকাশে যে তারাগুলি দেখা যায়, তাহা গোনা যায় না। আবার এই তারাগুলি ছাড়া আরও অনেক তারা আছে, যেগুলি আমরা এখনও দেখতে পাচ্ছিনে। এই পৃথিবীতে এবং এতগুলি গণনার অতীত গ্রহনক্ষত্রতারাতে সকল কাজই নিয়মে চলছে। যে মহান পুরু-ষের নিয়মে, যাঁহার আদেশে ইহাদের মধ্যে নিয়ম কাজ করছে,

তিনিই ঈশ্বর। তিনি নিশ্চয়ই আছেন; তিনি যদি না থাকেন, তবে আর কি-ই বা আছে? তিনি আছেন, তাই নিয়ম কাজ করছে, তাই আমরা আছি, তাই আমরা বেঁচে আছি। এস ভক্তি-ভরে আমরা তাঁকে বারবার নমস্কার করে জীবনকে সার্থক করি।

ঈশ্বর সব চেয়ে বেশী আছেন বলে তাঁর একটী নাম সত্য।

ঈশ্বর সত্য

তুমি আছ, আমি আছি, এই সব গাছপালা আছে, বাড়ী ঘর আছে, সেই জন্য এই সকলই সত্য। কিন্তু তুমি আমি মরে গেলে আমরা আর কি এখানে থাকি? এই গাছপালা পুড়ে গেলে আর কি গাছপালা থাকে? এই বাড়ীঘর ভূমিকম্পে চুরমার হয়ে গেলে কি আর বাড়ীঘর থাকে? তা থাকে না। সেই কারণে তুমি, আমি, গাছপালা, বাড়ীঘর যতক্ষণ যেখানে থাকবে, ততক্ষণ সেখানে সত্য। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের চেয়ে ঢের বেশী আছেন; বলতে কি, তিনি সকল সময়ে এবং সকল স্থানে একই ভাবে আছেন, তাই তিনি সব চেয়ে বেশী সত্য, অর্থাৎ সেই সত্যের আর লোপ হয় না।

ঈশ্বর যদি চিরকাল এবং সকল স্থানে সমান ভাবে না থাক-

ঈশ্বর সকল সত্যের মূল

তেন, তাহলে সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি থেকে এই পৃথিবীর ধুলো পর্য্যন্ত চিরকাল কি সমান-ভাবে আপনাদের কাজ করে যেতে পারত? কে তাহা-দিগকে সমানভাবে চালিয়ে নিতে পারত? ঈশ্বর চির-সত্য আছেন, তাই তিনিই ইহাদিগকে চিরকাল সমানভাবে

চালাচ্ছেন। সেই জন্য বলা যায় যে ঈশ্বর মহান সত্য, আর সকলই ছোটখাটো সত্য। সেই মহান সত্য আছেন বলেই আমরাও সত্য হয়েছি। সেই মহান সত্যেরই ছায়াতে আমরা সত্যরূপে জেগে আছি। সেই ঈশ্বরের অস্তিত্বরূপ মহান সত্যের ভাব নিয়ে যে কিছু ঘটনা হয় বা যা কিছু আছে, তাকেই আমরা সত্য বলি এবং সেই সকল সম্পর্কে যা কিছু বলা যায়, তাকেই আমরা সত্যকথা বলি। যা হয়নি, তা হয়েছে বল্লে সে কথাকে আমরা মিথ্যাকথা বলি। মিথ্যা কাজ করলে বা মিথ্যা কথা বল্লে এই জন্য আমরা ঈশ্বর থেকে দূরে গিয়ে পড়ি।

ঈশ্বরকে চাহিলে সত্য অবলম্বন করা চাই।

এতক্ষণে তোমরা বোধ হয় বুঝতে পারলে যে, ঈশ্বর সত্যস্বরূপ, এবং তোমরা তাঁর কাছে যেতে ইচ্ছা করলে, তাঁকে দেখতে চাইলে, সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় তোমাদিগকে সত্য কাজ করতে হবে এবং সত্য কথা বলতে হবে।

ওঁ সত্যাং

আজ তোমাদের কাণে একটী ছোট মন্ত্র দেব। সেই মন্ত্রটী সকলে রাত্রে, দুফুরে, সন্ধ্যাতে, সকল সময়ে সকল অবস্থায় জপ করে আপনার আপনার মনের সঙ্গে সেই মন্ত্রকে একেবারে মিশিয়ে নেবে, তাহলেই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাবে। সেই মন্ত্রটী এই—ওঁ সত্যং।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত শ্রীভগবৎকথায়
ঈশ্বর আছেন বিষয়ক প্রথম কথা সমাপ্ত।

—:ওঁ:—

দ্বিতীয় কথা—ঈশ্বর জানছেন (জ্ঞানং)।

ঈশ্বর আছেন, এই বিষয় প্রথম কথায় বুঝিয়েছি। আজ দ্বিতীয় কথায় বোঝাবার চেষ্টা করব যে ঈশ্বর সকলই জানছেন।

ঈশ্বর সকলই জানেন বল্লে বোঝায় যে ঈশ্বরের জ্ঞান আছে।

ঈশ্বরের জ্ঞান আছে

তাঁর যে জ্ঞান আছে, তাহা বোঝবার জন্য আমাদিগকে বেশী দূর যেতে হবে না। প্রতিদিন সকালে যখন সূর্য্য আকাশ ও পৃথিবীর মিলনস্থলে প্রভাতের কুয়াসা ভেদ করে চারিদিকে উজ্জ্বল কিরণ ছড়াতে ছড়াতে উঠতে থাকে, প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে যখন অন্ধকার আকাশকে গ্রহনক্ষত্রে ঢেকে যেতে দেখি, পূর্ণিমা-রাত্রে যখন পূর্ণচন্দ্রকে সন্ধ্যাবেলায় পূর্ব্বদিকে উঠে ভোরের বেলায় পশ্চিমে ডুবতে দেখি, তখনই ঈশ্বরের জ্ঞানের কত-না পরিচয় পাই। অন্তত এইটুকু বুঝতে পারি যে, যে ঈশ্বর সকল স্থানে এবং সকল সময়ে সমানভাবে আছেন, এবং যাঁর আদেশে সমস্ত প্রকৃতির কাজ সুনিয়মে চলছে, সেই ঈশ্বর একটী জ্ঞানশূন্য মূর্খ জীব নহেন।

জ্ঞানের লক্ষণ নিয়ম ও প্রকাশ। জ্ঞানী লোকের কাজ

জ্ঞানের একটী লক্ষণ নিয়ম

নিশ্চয়ই নিয়মের মধ্যে প্রকাশ পাবে। মনে কর যে একটা বাড়ীতে গিয়ে দেখা গেল যে চাকরদাসীরা সমস্ত কাজই ঠিক ঠিক নিয়মে করছে,

প্রত্যেক জিনিসটী ঠিকঠাক জায়গায় রাখছে, তাহলে সহজেই বোঝা যায় যে, যে মনিবের কথামত চাকরদাসীরা এমন সুনিয়মে কাজ করছে সেই মনিব নিশ্চয়ই একজন জ্ঞানবান লোক, সেই মনিব কখনই পাগল বা মূর্খ হতে পারে না। কিন্তু যদি দেখা যেত যে বাড়ীর কোথাওবা কতকগুলো ছেঁড়া বই পড়ে আছে, কোথাওবা কতকগুলো ভাঙ্গা জিনিষ পড়ে আছে, থালা বাটী প্রভৃতি উপযুক্ত পাত্রে খাবার জিনিষ না থেকে একরাশ ধুলোর উপর পড়ে আছে, তাহলে নিশ্চয়ই মনে হত যে, এ কেমন-ধারা কর্ত্তা—হয় কর্ত্তাটী একেবারে মূর্খ, আর না হয় তো সে পাগল। কোন কাজ নিয়মে হতে দেখলেই আমাদের স্বভাবতই মনে হয় যে সেই কাজের কোন নিয়ন্তা অথবা জ্ঞানবান কর্ত্তা আছে। এই কারণে নিয়মকে জ্ঞানের একটী লক্ষণ বলে এসেছি।

জ্ঞানের দ্বিতীয় লক্ষণ প্রকাশ।

জ্ঞানের দ্বিতীয় লক্ষণ প্রকাশ। যার যতটুকু জ্ঞান আছে, তার ততটুকু জ্ঞানই প্রকাশ পাবে। কুকুর প্রভৃতি জীবজন্তুদের যার যতটুকু জ্ঞান থাকে, সে সেইটুকু জ্ঞানই নানা উপায়ে প্রকাশ করতে চায়, করতে পারে এবং করতে থাকে। আমাদেরও যতটুকু জ্ঞান আছে, ততটুকুই আমরা প্রকাশ করতে চাই, করতে পারি এবং করতে থাকি। একজন যেই জানতে পারলেন যে বাষ্পের জিনিষ ওঠাবার শক্তি আছে, অমনি তিনি তাঁর সেই জ্ঞান* প্রকাশ করলেন এবং তার ফলে আমরা আজ কলের গাড়ী, কলের জাহাজ প্রভৃতি কত না

জিনিষ পেয়েছি। সেই একজন বুঝতে পারলেন যে বিদ্যুৎকে আকাশ থেকে নীচে নামান যায়, অমনি তিনি তাহা প্রকাশ করলেন এবং তার ফলে বজ্রাঘাত থেকে বাঁচাবার জন্য বাড়ীতে যে লোহার শিক দিতে হয়, সেই জ্ঞান পেয়েছি। এই দেখ না কেন, আমি ঈশ্বর সম্বন্ধে যদিও খুবই অল্প জেনেছি, কিন্তু সেইটুকুই তোমাদের কাছে প্রকাশ করতে উৎসুক হয়ে পড়েছি, বলতে কি, প্রকাশ না করে থাকতে পারছিনে। জ্ঞানের একটী লক্ষণ প্রকাশ বলেই এই পৃথিবীতে আমরা আজ কত রকমের জ্ঞানের কথা পাচ্ছি; কত রকম বিজ্ঞানের কথা, কত ধর্ম্মকথা, কত গাছ-পালা জীবজন্তুর কথা আমরা জানতে পারছি। এক একজন লোক এক একটী বিষয় জানতে পারছে, বুঝতে পারছে, আর অমনি সে তা প্রকাশ করে দিচ্ছে। এই রকম করেই তোমরা কত জানবার বিষয় পাচ্ছ, পড়বার বই পাচ্ছ।

প্রাকৃতিক নিয়মে ঈশ্বরের জ্ঞানের পরিচয়।

এখন এই দুই লক্ষণ ধরে দেখা যাক যে ঈশ্বরের জ্ঞান আছে কি না। প্রথম কথায় বলে এসেছি যে এই পৃথিবী সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতির কর্ত্তা যিনি তিনিই ঈশ্বর। আর, ইতিপূর্ব্বে ইসারাতেই মাত্র তোমাদিগকে এ-ও বলে এসেছি যে, এই পৃথিবী সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি সকলেই আপনাপন কাজ ঠিক ঠিক নিয়মে করে যাচ্ছে। তোমরা ভেবে দেখলে অবাক হবে যে এরা এমন সুন্দর নিয়মে কাজ করছে যে তার উল্টোপাল্টা হবার জো নেই। তোমরা জান যে জ্যোতিষীরা গুনে বলে দেন যে অমুক দিন অমুক সময়ে সূর্য্য-

গ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হবে। এই গণনা একেবারে সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে মিলে যাওয়া চাই। গণনা যদি একেবারে সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে না মিলে গেল, তাহলেই জানা গেল যে জ্যোতিষীর গণনায় ভুল হয়েছে। জ্যোতিষীরা এত সূক্ষ্ম গণনা কি করে করতে পারেন? তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন যে সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি একটা স্থির নিয়মে ঘুরছে। সেই নিয়মটাও তাঁরা জানতে পেরেছেন, এবং তাঁরা এ-ও জেনেছেন যে সেই নিয়মের অনিয়ম হবার সম্ভাবনা নেই। একথা তাঁরা জেনেছেন বলেই তাঁরা এত সূক্ষ্ম গণনা করতে পারেন। সেই যে নিয়ম তাঁরা জানতে পেরেছেন, সেই নিয়মের সূত্রে তাঁরা গুনে ঠিক করতে পেরেছেন যে অমুক সময়ে সূর্য্য অমুক স্থানে থাকবে, পৃথিবী অমুক স্থানে থাকবে, চন্দ্র অমুক স্থানে থাকবে এবং এই রকম স্থান-সংযোগ হলেই ঠিক অমুক মুহূর্ত্তে সূর্য্যগ্রহণ হবে, অমুক মুহূর্ত্তে চন্দ্রগ্রহণ হবে। তোমাদের সকলে বলতে পার না যে এক সেকেণ্ডে একটা আলোকরেখা কত মাইল চলে থাকে। জ্ঞানী লোকেরা কিন্তু পরীক্ষা করে দেখেছেন যে একটা আলোর রেখা এক সেকেণ্ডে প্রায় দুই লক্ষ মাইল চলে থাকে। জ্ঞানীলোকেরা যে এই সকল বিষয় গুনে বলতে পারেন, তার কারণ এই যে তাঁরা নিশ্চয় জানেন যে জগতের সকল কাজই একটা নিয়মে চলছে। যদি জগতের কাজগুলি অনিয়মে চলত, তাহলে তাঁরা কখনই গুনে বলতে পারতেন না যে অমুক সময়ে সূর্য্যগ্রহণ হবে কিম্বা প্রত্যেক আলোক-রেখা প্রতি মুহূর্ত্তে এত মাইল চলবেই।

যে নিয়মের বলে কোটী কোটী সূর্য্য চন্দ্র গ্রহনক্ষত্র ঘুরছে, যে নিয়মের বলে আমাদের সঙ্গে অগণ্য গ্রহনক্ষত্রের যোগসাধন হচ্ছে, যে নিয়মের বলে আমাদের এই একটী পৃথিবীতেই কতশত গাছপালা জন্মগ্রহণ করে আমাদের জীবনরক্ষার উপায় স্বরূপে দাঁড়িয়ে আছে, যে নিয়মের বলে শতসহস্র লক্ষ কোটী ভবিষ্যৎ যুগের লোকদের প্রাণধারণের জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বনজঙ্গল সকল পাথুরে কয়লার খনিতে পরিণত হয়েছে, সেই সকল নিয়মের কর্ত্তা কি তুমি আমি হতে পারি? সেই সকল নিয়মের কর্ত্তা যিনি, তিনিই আমাদের ঈশ্বর, তিনিই আমাদের জ্ঞানময় পরমেশ্বর।

ঋষিরা তাঁকে "জ্ঞানং" বলেছেন

তিনি কতশত নিয়ম করে দিয়েছেন, আর আমরা সেই সকল নিয়মের টুকরো মাত্র সময়ে সময়ে আবিষ্কার করে আমাদের জ্ঞানের বড়াই করি। যে সকল নিয়মের টুকরোমাত্র আবিষ্কার করে আমরা মহাজ্ঞানী বলে খ্যাতি লাভ করি, সেই সকল নিয়মের কর্ত্তা যদি জ্ঞানবান না হবেন, তবে আর কে জ্ঞানবান হবে? তিনি জ্ঞানবান বলেই তাঁর জ্ঞান তাঁর কাজে প্রকাশ পাচ্ছে। তাঁর জ্ঞানের কাছে আমাদের জ্ঞান কত ছোট কত অল্প। তাঁর জ্ঞানের সমস্ত আমরা মনে ধারণা করতেই পারিনে। এই জন্য ঋষিরা তাঁকে যেমন "সত্যং" বলেছেন, সেই রকম তাঁকে "জ্ঞানং" অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপও বলেছেন। তিনি যখন জ্ঞানস্বরূপ, তখন তিনি যে সর্ব্বকালে প্রকাশবান তাহা বলা বাহুল্য। পূর্ব্বেই বলে এসেছি যে জ্ঞানের একটী লক্ষণ হল প্রকাশ। ঋষিরাও তাই

ঈশ্বর স্বপ্রকাশ।

তাঁকে "স্বপ্রকাশ"ও বলেছেন। প্রত্যেক খণ্ডজ্ঞানের লক্ষণই যদি প্রকাশ হওয়া হল, তবে সকল জ্ঞানের আধার যে সকল বিষয়েই প্রকাশ হবেন এবং কাজেই সকল রকমে স্বপ্রকাশ অর্থাৎ আপনাপনি প্রকাশ হবেন, এটা তোমরা সহজেই বোধ হয় বুঝতে পারবে।

এইবারে তোমাদিগকে একটী মিষ্টি কথা বলে আমি এই দ্বিতীয় কথা শেষ করব। সে কথাটী এই যে ঈশ্বরকে আমরা জানতে পারি। ঈশ্বর জ্ঞান-স্বরূপ অর্থাৎ সকল জ্ঞানের আধার, আর আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্ঞানের আধার। আশ্চর্য্য এই যে সেই মহাজ্ঞানকে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের দ্বারা জানতে পারি। এর কারণ এই যে, জ্ঞান যেখানেই থাক, তা ঈশ্বরেরই নিয়মে সর্ব্বত্র সমধর্ম্মী। কুকুরকে মারলে সে এক প্রকার সুরে কাতরতা প্রকাশ করে; আমাদেরও আঘাত লাগলে আমরাও কাতর স্বরে ব্যথা প্রকাশ করি। সেই কারণেই তাহার কাতর ভাব আমরাও বুঝতে পারি এবং আমাদেরও কাতর ভাব কুকুর বুঝতে পারে। তোমাকে কোন জন্তু তাড়া করে এলে তুমি যদি ভয়ে পালাও, তবে সেই জন্তু তৎক্ষণাৎ তাহা বুঝতে পারবে এবং তোমাকে আরও তাড়া করবে। সার্কাসের পশুপক্ষী-গুলোকে যে নানা রকম খেলা শেখান হয় সেগুলি আর কিছুই নহে, কেবল খেলা শেখাবার যে ওস্তাদ, তারই জ্ঞানের কতক অংশ সেই পশুপক্ষীগুলোর মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। সেই পশুপক্ষীরা তাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে যতটুকু সম্ভব সেই পরিমাণে বুঝেছে

জ্ঞান সকল অবস্থায় সমধর্ম্মী

যে ওস্তাদ তার নিজের জ্ঞানে কি চায়। আবার ওস্তাদও বুঝেছে যে পশুপক্ষীরা তার ইচ্ছে ধরতে পেরেছে। এইখানে সেই ওস্তাদের জ্ঞান এবং পশুপক্ষীদের জ্ঞান সমধর্মী বা এক হয়ে গেল। সকল জ্ঞান যে সমধর্মী, এই নিয়মের বলে আজ মানুষ বানরের ভাষা, পিপড়ের ভাষা প্রভৃতি আবিষ্কার করতে উদ্যত হয়েছে।

জ্ঞান সমধর্মী বলে আমরা ঈশ্বরকে জানতে পারি

জ্ঞান সকল অবস্থায় সমধর্মী বলেই জ্ঞানের সূত্রে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গেও সমধর্মী হতে পারি। আমরা যেই এক একটী জ্ঞানের টুকরো আবিষ্কার করি অথবা কোন উপায়ে লাভ করি, তখন সেই-টুকু জ্ঞানের সূত্রে ঈশ্বরের সঙ্গে সমধর্মী হয়ে তাঁকে জানতে পারি। প্রতিমুহূর্ত্তেই যখন আমরা কোন না কোন বিষয়ের জ্ঞানলাভ করছি, তখন প্রতিমুহূর্ত্তেই সেই সেইটুকু জ্ঞানের সূত্রে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের যোগসাধন হচ্ছে এবং আমরা তাঁকে জানতে পারছি। ঈশ্বর সকল কালে সকল অবস্থায় আমাদিগকে জানলেও আমরা প্রতিমুহূর্ত্তের জ্ঞানলাভের সময় তাঁর সঙ্গে যথাপরিমাণে মিলে যাই।

ভাল বিষয় জান, মন্দ বিষয় ছেড়ে দাও

আমরা যতই ভাল বিষয় জানব, ভাল বিষয় ভাবব, ঈশ্বরকে ততই হৃদয়ে লাভ করব এবং শীঘ্র ঈশ্বরকে মনের মধ্যে জানতে পারব—তাঁর ইচ্ছের সঙ্গে আমাদের ইচ্ছে এক হয়ে যাবে। তাই পুরাতন ঋষিরা আমা-দিগকে সেই সুদূর অতীত হতে এই উপদেশ দিয়েছেন যে, আমরা

একলা আছি একথা যেন কখনই না মনে করি। ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছেন এবং আমাদের সকলকেই জানছেন। কখনই মন্দ কথা মন্দ বিষয় মনে স্থান দিওনা। নিশ্চয় জেনো যে ঈশ্বরের জ্ঞান তোমাদের মনের কথা সর্ব্বদাই জানছেন। তাঁর চোখ এড়াতে পারবেও না এবং এড়াতে যেও না। তিনি "সত্যং জ্ঞানং।"

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত শ্রীভগবৎকথায়
ঈশ্বর জানছেন বিষয়ক দ্বিতীয় কথা সমাপ্ত।

—ঃওঁঃ—

তৃতীয় কথা—ঈশ্বর অনন্ত (অনন্তং ব্রহ্ম)।

আর সকলই সান্ত বা সীমাবদ্ধ, ঈশ্বর অনন্ত অসীম। ঈশ্বরের অন্ত নেই, শেষ নেই—কোন বিষয়েই তাঁর সীমা নেই। তুমি, আমি, জীবজন্তু, গাছপালা, সোনারূপো প্রভৃতি যা কিছু এই জগতচরাচরে আছে, সকলই সান্ত—সকলেরই একটা শেষ আছে। আর সেই কারণেই আমাদের দয়ামায়া প্রভৃতি মনের ভাব, আমাদের জ্ঞান প্রভৃতি সকলই সান্ত, সীমাবদ্ধ।

সান্ত ও অনন্ত।

জগতচরাচর এমনই গঠিত যে ইহার সকলই স্থানে সীমাবদ্ধ। যা কিছু আছে, তা একটা না একটা স্থান অধিকার করে থাকবেই—সুতরাং তা সেইটুকু স্থানের দ্বারা সীমাবদ্ধ। এমন প্রকাণ্ড যে সূর্য্য, পৃথিবী এবং গ্রহনক্ষত্র সকল, ইহারা সকলেই নিজের নিজের থাকবার যায়গা দ্বারা সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ ইহারা যতটুকু যায়গা নিয়ে আছে, তার বেশী যায়গা নিয়ে নেই এবং তাদের থাকবার যায়গা ছেড়ে আরো বেশী যায়গা পড়ে আছে।

জগতের সকলই স্থানে সীমাবদ্ধ।

জগতচরাচরের সকলই যেমন স্থানে সীমাবদ্ধ, সেইরূপ সকলই কালেতেও সীমাবদ্ধ। যে সময়ে যে ঘটনাটী হয়, সেই সময়েই সেই ঘটনাটী হয়ে গেল;

জগতের সকলই কালে সীমাবদ্ধ।

যে সময়ে যে জিনিষটী যেখানে থাকল, সেই সময়েই সেই জিনিসটী সেইখানে থাকল; যে সময়ে আমি যে জ্ঞান পেলুম বা যে ভাবকে মনে স্থান দিলুম, সেই সময়েই সেই জ্ঞান ও সেই ভাব আমার মনে ছিল, অন্য সময়ে ছিল না। আমরা ঠিক একই সময়ে বিভিন্ন বিষয় যে জানতে পারিনে বা ভাবতে পারিনে, সেইটীই আমাদের ভাবজ্ঞান প্রভৃতির সীমাবদ্ধ হবার একটী প্রমাণ।

সীমাবদ্ধ বলেই অসীমকে জানিতে পারি।

এখন তোমরা বুঝতে পেরেছ বোধ হয় যে জগতে যা কিছু আছে, ছিল বা পরে হবে, সকলেরই একটা সীমা আছে, ছিল ও থাকিবে। এক কথায় জগতের সকলই সান্ত, সীমাবদ্ধ। আমরা এই রকম সীমাবদ্ধ বলেই তার বিপরীতে বুঝতে পারছি যে সীমাবদ্ধের অতীত কোন কিছু আছে, কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি, জানতে পাচ্ছি যে আমাদের সীমা ছেড়ে, আমাদের দৃষ্টিবলয় ছেড়ে আরো ঢের স্থান আছে এবং আমাদের জ্ঞানের সীমা ছেড়ে আরো ঢের জ্ঞান আছে, আর আমাদের জীবনকাল ছেড়ে আরও ঢের সময় ছিল ও আছে।

অসীম স্থান।

আগে স্থানের বিষয় ধর। এই কলম এতটুকু যায়গা জুড়ে আছে; তার পরেও তো অনেক যায়গা পড়ে আছে। আবার সেই অতিরিক্ত স্থানের এক অংশে এই টেবিল আছে, তার পরেও তো অনেক যায়গা পড়ে আছে। আবার সেই অতিরিক্ত স্থানেরও এক অংশে এই

যাড়ৎ ঘর আছে; আবার তারও অতিরিক্ত অনেক স্থান পড়ে আছে। এই রকম দেখতে দেখতে দেখা যাবে যে এই পৃথিবীতে যত কিছু জিনিষ যতটা কেন যায়গা জুড়ে থাক, সেই যায়গার অতিরিক্ত আরো ঢের যায়গা পড়ে থাকে। পৃথিবীর প্রত্যেক বিন্দু স্থানও যদি কোন না কোন জিনিসে ঢেকে যায়, তাহলেও দেখবে যে পৃথিবীর থাকবার স্থান ছাড়া ঢের ঢের অতিরিক্ত স্থান পড়ে আছে; সেই অতিরিক্ত স্থানে সূর্য্যচন্দ্র গ্রহনক্ষত্রগণ বসে আছে। এই রকম ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে যে যতই জিনিস জগতচরাচরে থাক, তারও অতিরিক্ত আরও অনেক অতিরিক্ত স্থান পড়ে আছে—তা না হলে সেই সব জিনিস থাকতে পারে কি করে?

আকাশে অনন্তের আভাস।

এই স্থান কোথায়?—আকাশে। আকাশ আর কিছুই নয়, কেবল একটা সুবিস্তীর্ণ স্থান—এত প্রকাণ্ড যে আমরা কল্পনাতেও আনতে পারিনে যে ইহা কত বড়। যত কিছু জিনিষ এই জগতে ছিল, আছে বা থাকবে, সমস্তই এই আকাশের মধ্যে কোথাও না কোথাও ছিল, আছে বা থাকবে—আকাশ ছেড়ে কোন জিনিসই থাকতে পারে না। আমরা স্থানে সীমাবদ্ধ বলেই তদ্বিপরীতে এই আকাশ থেকেই স্থান বিষয়ে অনন্তের আভাস পাই। আকাশ অনন্ত বলেই জগতের সকল জিনিষই তাহাতে ধরে। এই জন্য কোন কোন ঋষি ঈশ্বরের অনন্ত ভাব বোঝাবার জন্য তাঁর একটী নাম দিয়েছেন আকাশ।

কিন্তু এই আকাশই কি খাঁটী অনন্ত বা সীমাহীন? তা নয়। আমরা তো আকাশকে ভাগ করে বলতে পারছি যে এইটুকু স্থান, ঐটুকু স্থান। এই রকম স্থানকে সীমাবদ্ধ করবার ক্ষমতা থেকেই বুঝতে পারছি যে আমরা সমস্ত আকাশকে ঠিক সীমার মধ্যে দেখতে না পেলেও, ধরতে না পারলেও, আকাশের কোন না কোন সীমা আছে। কিন্তু সেই সীমা তোমার আমার ধরবার সাধ্য নেই। সেই সীমা জানবার জন্য অনন্ত আকাশ হতেও অনন্ত এক জ্ঞানবান পুরুষ চাই। সেই অনন্ত পুরুষই হলেন অনন্ত ঈশ্বর।

আকাশ খাঁটী অনন্ত নহে—ঈশ্বর অনন্ত।

যেমন দেখলুম যে ঈশ্বর স্থানে অনন্ত, সেইরূপ তিনি কালেও অনন্ত। আগেই বলে এসেছি যে জগৎ-চরাচরের সকলই যেমন স্থানে সীমাবদ্ধ, সেই-রকম কালেতেও সীমাবদ্ধ। যে সময়ে যে ঘটনাটী হয়, যে জ্ঞান লাভ হয় বা যে ভাব মনে উদিত হয়, সেই সময়েই সেইটী হয়ে গেল। কিন্তু এটা আমরা জানি যে সেই সময়ের আগেও অনেক সময় চলে গেছে এবং তার পরেও অনেক সময় থাকবে। তোমরা এটা বেশ জান যে সেই অতীত কালে কতশত ঘটনা ঘটে গেছে, আর সেই কারণেই তোমরা এটাও বেশ মনে করে নিতে পার যে ভবিষ্যতে আরও কতশত ঘটনা ঘটবে। এই সকল ঘটনা কোথায় হয়েছে বা হবে? কালেতে। এই কাল এত বিস্তৃত যে ইহার সমস্তটাকে আমরা কল্পনাতেও আনতে পারিনে। যা কিছু ঘটনা ঘটে গেছে, ঘটছে, বা ঘটবে—

কালেতে অনন্তের আভাস।

কালকে ছেড়ে কোন ঘটনাই ঘটতে পারে না। যতদূর অতীত কাল কল্পনাতে আনতে পারি, তারো পিছনে আরো কত অতীত কাল পড়ে আছে। যতদূর ভবিষ্যৎ কাল কল্পনাতে আনতে পারি, তারো পরে আরো কত ভবিষ্যৎ কাল পড়ে আছে। আমরা কালেতে সীমাবদ্ধ বলেই তদ্বিপরীতে এই কাল থেকেই আর এক দিক দিয়ে অনন্তের আভাস পাই। কাল অনন্ত বলেই কালের সকল ঘটনাই তাহাতে ধরে।

কাল খাঁটী অনন্ত নহে ---ঈশ্বর অনন্ত।

কিন্তু এই কালও খাঁটী অনন্ত বা সীমাহীন নয়। সূর্য্যোদয় থেকেই হউক বা অন্য যে কোন উপায়ে হউক, আমরা তো কালকে ভাগ করে বলতে পারছি যে এইটুকু কাল, ঐটুকু কাল, এক ঘণ্টা, একদিন ইত্যাদি। এই রকম কালকে সীমাবদ্ধ করবার ক্ষমতা থেকেই বুঝতে পারছি যে আমরা সমস্ত কালকে মনেতে ধরতে না পারলেও কালের একটা না একটা সীমা আছে। আকাশই বল, আর কালই বল, তারা খাঁটী সীমাহীন হলে আমাদের সীমাবদ্ধ ভাগের মধ্যে আসতে পারত না। কিন্তু কালের সেই সীমা ধরা তোমার আমার সাধ্যের অতীত। সেই সীমা জানবার জন্য অনন্ত কাল হতেও অনন্ত এক জ্ঞানবান পুরুষ চাই। সেই অনন্ত পুরুষই অনন্ত ঈশ্বর। এই কাল হতে সেই অনন্ত পুরুষের অনন্ত ভাবের কতকটা আভাস পাওয়া যায় বলে ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মারা ঈশ্বরের আর এক নাম দিয়েছেন মহাকাল।

ঈশ্বর যখন স্থানেতে অনন্ত এবং কালেতে অনন্ত, তখন তিনি

ঈশ্বর সকল বিষয়ে অনন্ত।

যে ভাব, জ্ঞান প্রভৃতি বিষয়েও অনন্ত হবেন, সেটা বুঝতে বোধ হয় বিশেষ কষ্ট হবে না। যে কিছু ভাব জ্ঞান প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে সম্পর্করহিত ঘটনা আছে, আগেই বলে এসেছি যে সে সমস্তই কাল বা সময়কে অবলম্বন করে আছে। আমরা জানতে পারি যে অমুক সময়ে আমাদের মনে এই ভাব এল, অমুক সময়ে অমুক বিষয়ে জ্ঞান পেলুম। এই রকমে আমাদের জ্ঞানে আমরা সময়কে ছেড়ে কোন ভাব, জ্ঞান বা ঘটনার বিষয় ভাবতেই পারিনে। আর, সত্য সত্যই দেখতে পাই যে জগতের প্রত্যেক ঘটনাই কোন না কোন রকমে স্থান বা কালকে অবলম্বন করে থাকে। ঈশ্বর যখন সেই স্থান ও কাল সম্বন্ধে অনন্ত এবং যখন তিনি জ্ঞানময়, তখন তিনি নিশ্চয়ই ভাব, জ্ঞান প্রভৃতি বিষয়েও অনন্ত।

ঈশ্বরকে কখন অনুভব করি?

আমরা ঈশ্বরের অনন্তত্ব বিষয়ে অনেক বড় বড় কথা বল্লুম বটে, কিন্তু আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে কি সেটা ধারণা করতে পারি? ঈশ্বরের অনন্তত্ব আমরা সম্পূর্ণ ধারণা করতে না পারলেও কবিত্বপূর্ণ ভাষায় এটা বলা যেতে পারে যে আমরা সময়ে সময়ে আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরের অনন্তভাবের কিনারাটুকু ছুঁয়ে আসতে পারি। আমরা সীমাবদ্ধ বলেই তদ্বিপরীতে জানতে পারি যে এক অনন্ত মহান পুরুষ আছেন, যাঁকে অবলম্বন করে আমরা আছি, আকাশ আছে, কাল আছে। আবার জ্ঞানে এই রকম জানতে পারলেও সকল সময়ে আমরা তাঁকে অনুভব করতে পারিনে। যখন

সংসারের ছোটখাটো ঘটনা, ছোটখাটো কথা থেকে আমরা আমাদের জ্ঞানকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাঁর জ্ঞানে যুক্ত করে দিতে উদ্যত হই, আমাদের ইচ্ছাকে তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত করতে চাই, তখনই ক্ষণিক বিদ্যুৎপ্রকাশের মত হৃদয়ে ক্ষণেকের জন্য তাঁকে অনুভব করতে পারি।

অনন্তের ক্ষয় নেই

আমরা এ সংসারে যে কিছু জ্ঞান ভাব পাচ্ছি, সে সকলই সেই জ্ঞান ও ভাবের অনন্ত ভাণ্ডার থেকেই পাচ্ছি। কিন্তু তাই বলে তোমরা এটা মনে কোরো না যে সেই অক্ষয় ভাণ্ডারের কোন ক্ষয় হল বা কম হয়ে গেল। ঈশ্বর আশ্চর্য্য নিয়ম করে দিয়েছেন যে জ্ঞান, ভাব প্রভৃতির ভাগ কাহাকে দিলেও তার কিছুই কমে না। মনে কর যে তুমি জান যে দুই আর দুয়ে চার হয়। তোমার এই জ্ঞানটুকু আর কাহাকেও দিলে কি সে জ্ঞান একটুও কমে গেল? তোমার দয়ামায়া যদি জীবজন্তুর উপর ছড়িয়ে দাও, তাহলে কি সেই দয়ামায়া এতটুকুও কমে যেতে পারে? সেই রকম সেই অনন্ত পরমেশ্বর তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার, তাঁর ভাবভাণ্ডার জগতে ছড়িয়ে রেখেছেন, কিন্তু তাতে তাঁর অনন্তত্বের কোনরূপ অভাব ঘটে না। এক কথায় তাঁর কোনরূপ ক্ষয় নেই।

ঈশ্বর স্বপ্রকাশ

তিনি স্বপ্রকাশ। তাঁর প্রকাশ জগতের অণুতে অণুতে। সেই প্রকাশ অনুভব করবার জন্য আমাদের ইচ্ছা চাই, উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করা চাই। মধ্যাহ্ন কালে যখন সূর্য্য মাথার উপরে ধকধক করে জলতে থাকে,

আমি যদি সেই সময়ে আমার ঘরটীকে সম্পূর্ণ অন্ধকার করে ঘুমিয়ে কাটাই, আর পরে বলি যে আমি সূর্য্য দেখিনি বলে সূর্য্য ওঠেনি, সে কথা কি রকম হাস্যাস্পদ। যে ঈশ্বরের প্রকাশ সূর্য্যে, যে ঈশ্বরের প্রকাশ অগণ্য গ্রহনক্ষত্রে, যে ঈশ্বরের প্রকাশ জগতের প্রাণরাজ্যে, যে ঈশ্বরের প্রকাশ মানবের জ্ঞানরাজ্যে, যে ঈশ্বরের প্রকাশ প্রতি অণুতে, প্রতি নিমেষে, সেই ঈশ্বরকে আমাদের যত্নের অভাবে হৃদয়ে অনুভব করিতে না পারলেই তাঁর স্বপ্রকাশত্বে সন্দেহ প্রকাশ করা কি ততোধিক হাস্যাস্পদ নয়?

ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম

তোমরা বেশ করে নিজের নিজের হৃদয়ের দিকে চেয়ে দেখ—দেখবে যে সেখানে সেই পুরাতন পরমেশ্বর বিরাজমান আছেন। কিন্তু তাঁকে যতই দেখতে পাবে ততই তাঁকে আরো দেখবার ইচ্ছা হবে। যখন দেখতে দেখতে ক্রমে দেখবে যে তাঁর অন্ত পাচ্ছ না, তখন তোমাদের হৃদয় স্তম্ভিত হয়ে যাবে এবং সেই স্তম্ভিত হৃদয়ে এক গভীর প্রশ্ন উঠবে—"অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর।" ঋষিরা এই প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছেন, সেই উত্তরেই তখন শান্তি লাভ করবে। ঋষিদের সেই উত্তর হচ্ছে—"ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"—তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্ম। তোমরা এই মন্ত্র হৃদয়ে কৌস্তুভমণির মত ধারণ করে হৃদয়ে অপার শান্তি লাভ কর।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত শ্রীভগবৎকথায়
ঈশ্বর অনন্ত বিষয়ক তৃতীয় কথা সমাপ্ত।

—:ওঁ:—

চতুর্থ কথা—ঈশ্বর আনন্দময় (আনন্দরূপং) ।

ঈশ্বর আনন্দরূপে প্রকাশ পাচ্ছেন। তাঁর বিষয়ে যিনিই একটু বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন, যিনি ঈশ্বরে একটীবারও ডুবে, তাঁর সঙ্গে আপনাকে সংযুক্ত করে ক্ষণকালের জন্যও তাঁকে স্পর্শ করতে পেরেছেন, তিনিই বলে গেছেন যে ঈশ্বর সকল স্থানে ও সকল সময়ে আপনার আনন্দরূপে প্রকাশ পাচ্ছেন। ঋষিরা তাঁকে কেবলমাত্র আনন্দরূপ বলেই তৃপ্তি লাভ করেন নি। তাঁরা স্বয়ং ঈশ্বরকে আনন্দরূপ জেনে যে অনুপম আনন্দ লাভ করেছিলেন, সেই আনন্দ ধরে ঈশ্বরের আনন্দরূপ প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন যে, তিনি রসস্বরূপ। এই "রসস্বরূপ" কথাটীতে ঋষিদের সমস্ত আনন্দ, সমস্ত প্রেম, হৃদয়ের সমস্ত ভাল ভাব যেন ঘন হয়ে, একত্র মিলিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তোমরাও যদি ঈশ্বরকে এক মনে জানবার চেষ্টা কর, দেখবে যে তিনি স্বীয় আনন্দরূপে, রসস্বরূপে জগতের সর্ব্বত্র এবং তোমাদের হৃদয়ে চিরবিরাজমান আছেন।

ঈশ্বর রসস্বরূপ

তিনি আনন্দরূপ বলেই তো জগতে এত আনন্দ ছড়িয়ে আছে। তোমরা যখন ভাই-বোনে খেলা কর, তখন কত না আনন্দ পাও। তোমাদের মা যখন নিজের কোলেতে তোমাদিগকে ডেকে

একটী মূল প্রস্রবণ থেকে আনন্দরাশি নেমে এসেছে

নিয়ে তোমাদের গায়ে হাত বুলিয়ে দেন, আদর যত্ন করেন ; তোমাদের পিতা যখন তোমাদিগকে ভাল ভাল বিষয়ে শিক্ষা দেন, তখন তোমাদের কত না আনন্দ হয়। তোমরা যখন ফুটবল খেলে শরীরের স্বাস্থ্য লাভ কর, তখন তোমাদের শরীরে ও মনে কেমন একটা স্ফূর্ত্তি ও আনন্দ আসে। এই যে এত আনন্দ জগতে ছড়ানো আছে, এত আনন্দ আসে কোথা থেকে ? তোমরা বেশ ভেবে বুঝে দেখো যে এত আনন্দরাশি আকাশ থেকে আপনাপনি ঝুপ করে পড়তে পারে না। আগে দেখে এসেছি যে যত কিছু জ্ঞান আমরা পাচ্ছি, সে সকলই সেই ঈশ্বরের জ্ঞানের ছায়ামাত্র। সেই রকম যত কিছু আনন্দ এই জগতে ছড়ানো দেখি, সে সকলই নিশ্চয়ই এক মহান অখণ্ড আনন্দের ছায়া। নিশ্চয়ই একটা মূল প্রস্রবণ বা ঝরণা আছে, যেখান থেকে এই আনন্দরাশি নেমে এসে জগতসংসারকে একেবারে ছেয়ে ফেলেছে। তোমরা এই কলকাতায় থেকে দেখতে পাও যে গঙ্গায় কত জল—এত জল যে তাতে কত শত বড় বড় ষ্টীমার জাহাজ, কত শত জীবজন্তু স্থান পায়। এই জল আপনাপনি আসে নি। সেই কতশত ক্রোশ দূরে হিমালয়ের ভিতর ছোটখাটো একটী ঝরণা আছে, সেই ঝরণা থেকে অবিশ্রামে জল পড়তে পড়তে এত বড় গঙ্গানদীর সৃষ্টি হয়েছে। সেই রকম যে আনন্দ জগতকে ঢেকে রেখেছে, সেই আনন্দরাশিরও নিশ্চয়ই একটী মূল ঝরণা আছে। একটী ভাল গান শুনে তোমরা মুগ্ধ হলে, আনন্দে ডুবে গেলে ; ধার্ম্মিকের কাছে ধর্ম্মকথা শুনে সংসারের ছোটখাটো কথা ছেড়ে দিয়ে এক

আশ্চর্য্য আনন্দ অনুভব করলে। একটা মূল আনন্দ না থাকলে এই আনন্দ আমরা পাই কি করে? গ্রীষ্মকালে মুক্ত দক্ষিণে বাতাসে বসে সন্ধ্যার মহিমা উপভোগ করতে করতে যে অনুপম আনন্দ পাও; বর্ষার পর শরতের পৌর্ণমাসীতে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না উপভোগ করে যে আনন্দ পাও, এই সকল আনন্দ কি আপনা-আপনি আসতে পারে? • এই সমস্ত আনন্দের ভাব যে একটা মূল প্রস্রবণ থেকে নেমে এসেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সকল আনন্দের মধ্যে একটা সাধারণ ভাব আছে

সকল আনন্দেরই মূলে যে একটা মহান আনন্দ আছে, তার বিশেষ একটি প্রমাণ এই যে, কোথায় মানুষ আর কোথায় পশুপক্ষী, সকলেরই আনন্দের মধ্যে একটা সাধারণ ভাব দেখতে পাওয়া যায়। ক্ষিধের সময় খাবার পেলে তোমারও যেমন আনন্দ হয়, আমারও সেই রকম আনন্দ হয়। ক্ষিধের সময় খাবার পেলে পশুপক্ষী জীব-জন্তুরাও সেই একই আনন্দ লাভ করে। আবার আমি আনন্দ প্রকাশ করলে তুমি বুঝতে পার এবং তোমার আনন্দ আমি বুঝতে পারি। মানুষের আনন্দ পশুপক্ষী বুঝতে পারে এবং পশুপক্ষীর আনন্দ মানুষ বুঝতে পারে। আরও দেখ, শতসহস্র বৎসর পূর্ব্বে কেহ হয় তো কোন বিষয়ে আনন্দ প্রকাশ করে গেছে, আজ তার বিবরণ পড়ে আমরাও সেই আনন্দ অনুভব করছি। এই আলাদা আলাদা আনন্দভাবের মধ্যে মূলগত একটা সাধারণ ভাব আছে বলেই না আমরা এই রকম পরস্পরের আনন্দ বুঝতে পারি?

এই বিভিন্নতার মধ্যে একতা থাকে কেন? কোথা হতে এই একতা আসে? আগে দেখে এসেছি যে ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ এবং জগতের সমস্ত জ্ঞান সেই মহান জ্ঞান থেকেই নেমে এসেছে বলেই তাদের মধ্যে একটা মূলগত একতা আছে; এবং সেই একতার কারণে আমরা দেশদেশান্তরের অধিবাসীদের জ্ঞানের মধ্যে প্রবেশ করতে পারি; এমন কি, গ্রহগ্রহান্তরেরও অধিবাসীদের কার্য্য বুঝতে পেরেছি বলে স্পর্দ্ধা করি। সেই রকম, একই আনন্দস্বরূপ পুরুষ থেকে জগতের এই আনন্দস্রোত নেমে এসেছে বলেই আমরা সমস্ত আনন্দরাশির মধ্যে একটা মূলগত একতা দেখতে পাই এবং এখানে বসেই কোথায় ইংরাজ ফরাসী, কোথায় চীনবাসী ও জাপানী, কোথায় কুমেরু ও সুমেরু-বাসী এবং কোথায় অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রসমূহের অধিবাসী দেবযক্ষ, সকলেরই আনন্দ হৃদয়ে অনুভব করতে পারি। এই আনন্দ-স্বরূপ পুরুষই আমাদের নিত্য পূজার প্রাণারাম পরমেশ্বর।

বিভিন্ন আনন্দভাবের মূলগত একতায় আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরের পরিচয়

আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বর যখন আছেন, তখন সংসারে নিরানন্দ আসে কেন? সীমার মধ্যে বাসই, সীমা লয়ে জন্মগ্রহণই এই নিরানন্দের কারণ। ঈশ্বর অনন্ত এবং অখণ্ড নিত্য আনন্দ তাঁরই। আমরা সীমাবদ্ধ, সুতরাং আমাদের নিত্য অখণ্ড আনন্দ আসতেই পারে না—কোথাও না। কোথাও তার সীমা থাকবেই এবং সেখানেই সীমা সেইখানেই আনন্দের অভাব হল। আমরা

সীমাবদ্ধ থাকাই নিরানন্দের কারণ

সীমাবদ্ধ না হয়ে থাকতে পারিনে এবং কাজেই আমাদের আনন্দেরও কোন না কোন সীমা না এসে থাকতে পারে না। ঈশ্বর অনন্ত বলেই আমরা সান্ত। আমাদের সীমা না থাকলে তো আমরা অনন্ত ঈশ্বরের সঙ্গে একেবারে এক ও অভিন্ন হয়ে যেতুম। তাহলে তো সৃষ্টিই থাকতে পারত না। জগতে যখন আমরা সীমা নিয়েই এসেছি, তখন আমাদের আনন্দেরও সীমা বা অভাব আছে জানতে হবে। এই যে মুক্ত আকাশ, এই আকাশও সেই অনন্ত পুরুষের কাছে সীমাবদ্ধ বলে এসেছি। তাই এই আকাশেরও মুখ সময়ে সময়ে মেঘাচ্ছন্ন দেখা যায়। মেঘ এল, বর্ষা নেমে গেল—তখন আবার মুক্ত আকাশ মুক্ত আকাশই রয়ে গেল। এই যে মুক্ত কাল এই কালও সেই অনন্ত পুরুষের কাছে সীমাবদ্ধ বলে এসেছি। তাই এই কালেরও মুখ সময়ে সময়ে মেঘাচ্ছন্ন দেখতে পাই। যুদ্ধের মেঘ আসে, রক্তের বর্ষা নেমে যায়, তখন আবার মুক্ত কাল মুক্ত কালই থেকে যায়।

সীমা দুই প্রকার

তবেই দেখা যাচ্ছে যে নিরানন্দ দূর করতে গেলে আমাদের আনন্দের সীমা ভাঙ্গতে হবে এবং আনন্দস্বরূপ ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হতে হবে। যখন সীমা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করাতেই আনন্দেরও সীমা এসেছে, তখন আনন্দের সীমা ভেঙ্গে আনন্দের পথে এগোতে হলে আমাদের অন্যান্য বিষয়েরও সীমা ভাঙ্গতে হবে। আমরা দুই রকম সীমা দেখতে পাই—এক ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট এবং দ্বিতীয় উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ও স্বরচিত। স্থান ও কালের সীমা ঈশ্বর-

নির্দ্দিষ্ট। একই জিনিস একই সময়ে একের বেশী স্থান অধিকার করিতে পারে না, এই হল স্থানের সীমা; একই কালে একের বেশী ভাবনা মনে স্থান দেওয়া যায় না, এই হল কালের সীমা; যে মুহূর্ত্ত চলে যায় সে মুহূর্ত্ত আর ফিরে আসে না, এই হল কালের সীমা। এই সকল ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট সীমা ভাঙ্গবার প্রয়োজন হয় না; বরঞ্চ এই সকল সীমা অবলম্বন করলে আনন্দের পথে সহজে অগ্রসর হওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলতে পারি যে কালের যে দুটো সীমার কথা বলেছি, তার মধ্যে প্রথমটার ফলে একাগ্রতা, মনোযোগ এবং ঈশ্বরে একনিষ্ঠা প্রভৃতি পাওয়া যায়। ভগবান এমনই নিয়ম করে দিয়েছেন যে তাঁর নির্দ্দিষ্ট সীমা ঠিক ঠিক অনুসরণ করলে সেই সীমা ক্রমে বিস্তৃত হতে থাকে এবং আমাদিগকে মুক্তির আস্বাদ দিতে দিতে ক্রমে তাঁরই মুক্তপথের পথিক করে দেয়। সূর্য্য যখন নিজের গরমে বেশী গরম হয়ে ওঠে, তখন সেই গরমের ফলে সূর্য্যের ভিতর থেকে কতকটা জিনিস বাহিরে বেরিয়ে মেঘের সৃষ্টি করে এবং সেই মেঘ থেকে জল পড়ে সূর্য্যের উপরিভাগ কতকটা ঠাণ্ডা করে। সেই রকম ক্রমাগত বেশী জ্ঞানলাভের ইচ্ছা প্রভৃতি ঈশ্বরপ্রদত্ত সীমার অনুসরণ করতে করতে কখন সেই সীমা ভেঙ্গে তাঁর কাছে যাবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে এবং সীমাতে বাধা পেয়ে মানুষ ক্ষণিক নিরানন্দে মুহ্যমান হতে চায়, তখন আমাদের হৃদয় থেকে এক তেজ বেরিয়ে ঈশ্বরের অসীম ভাবের দিকে ছুটে যায়। ভগবানও তখন

ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট সীমা অবলম্বনে আমাদের মঙ্গল

আপনার করুণা বর্ষণ করে সেই আগেকার সীমা করুণাস্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে আমাদের বিচরণক্ষেত্র বিস্তৃত করে দেন এবং নিরানন্দ দূর করে হৃদয়কে এক অপূর্ব্ব আনন্দসাগরে শীতল করেন।

কিন্তু সংসারে আমরা সচরাচর যে ভাবকে দুঃখ কষ্ট বা নিরানন্দ বলি, তার কারণ উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বা স্বরচিত সীমার সঙ্কীর্ণতা। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সীমার একটী দৃষ্টান্ত দিই। মনে কর যে কোন লোক বাপমায়ের দোষে পেটুক হয়েছে।

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সীমাতে অনিষ্ট

আহার বিষয়ে ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট সীমা এই যে ক্ষিধের সময় আহার করলে শরীরে স্বাস্থ্য আসে, মনে স্ফূর্ত্তি হয় এবং একটী আনন্দের ভাব পাই। কিন্তু পেটুক লোক কেবল খেতে চায়—ক্ষিধে অক্ষিধে জানে না, কেবল আহার চাই—সে কেবল খাবার সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে বাস করে, তার বাহিরে যেতে পারে না। কাজেই খাবার না পেলেই তার বড়ই কষ্ট হয়, নিরানন্দ আসে। এই কলকাতায় এক মস্ত পালোয়ান ছিল—তার জীবনে আর কোন কাজ ছিল না, সকালে বিকেলে কুস্তি করত, আর সমস্ত দিন ধরে খেত। তার সের সের ঘি চাই, সের সের চাল চাই, এই রকম রাশি রাশি খাবার পেলে তার পেট ভরত। বড়বাজারের অনেক ধনী লোক তার সেই খাবার যোগাতেন, কিন্তু চিরকাল আর কে সে রকম খাবার দিতে থাকবে? এমন সময় এল যে তার পেট ভরাবার মত খাবার আর জুটত না। ফলে

হোল এই যে একদিন সে বড়বাজারের মিষ্টির দোকান লুট করে খেতে আরম্ভ করলে এবং সেই কারণে তাকে জেলখানায় যেতে হল।

স্বরচিত সীমাতে নিরানন্দ

স্বরচিত সীমাতেও যথেষ্ট নিরানন্দ আসে। সুন্দর জিনিসের সৌন্দর্য্য দেখে আমাদের ভাল লাগে, এইটুকু হল ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট সীমা। কিন্তু যদি সেই সৌন্দর্য্যপ্রিয়তাকে বিকৃত করে কেবল বাহিরের সৌন্দর্য্যের পিছনে পাগল হই এবং সেই কারণে অপরের কোন সুন্দর জিনিস দেখে আত্মসাৎ করি, তাহলেই একটা লোভের সীমা রচনা করলুম। সেই লোভের ফলে হয়তো শাস্তি পেতে পারি এবং কাজেই নিরানন্দ আসতে পারে। শাস্তি না পেলেও চুরি ধরা পড়বার ভয়ই সেই লোভী লোকের যথেষ্ট শাস্তি। অনেক প্রকারের স্বরচিত বা উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত সীমাই আমাদিগকে বড়ই কষ্ট দেয়। মোটামুটি সেগুলিকে ছয় শ্রেণীতে

ছয় রিপু

ভাগ করা যেতে পারে—সেই ছয়টী হচ্ছে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য। এই ছয়টী সীমা থেকে আমরা এত কষ্ট পাই যে ইহাদিগকে সাধারণতঃ আমরা ছয় রিপু বা ছয় শত্রু বলি। অনেক সময়ে আমরা নিজেকে স্বরচিত সীমার মধ্যে পুরে আহারের লোভে কলে পড়া ইন্দুরের মত খুব কষ্ট পাই এবং সময়ে সময়ে তার ফলে জীবনের আশাও ছেড়ে দিতে হয়। চীনবাসীরা বাঁশ প্রভৃতি বড় বড় গাছকে ঘরে রাঁখবার মত ছোট করবার জন্য তাদের বাড়বার মুখেই গামলা

প্রভৃতি পাত্র চাপা দেয়, তাতে সেই সমস্ত গাছের মুক্ত প্রশস্ত ভাব একেবারেই চলে যায়। সেই রকম আমরাও যতই আমাদের বিচরণ-সীমা সঙ্কীর্ণ করব, ততই জীবনপথের বদলে মৃত্যুপথে নামতে থাকব। আমরা মানুষ—আমরা ইচ্ছা করলেই সঙ্কীর্ণ সীমা নির্মূল করতে পারি। তখন আমরা নিরানন্দসাগরে ডুবে কেবল হাহুতাশ করব কেন? বাঁধ ভেঙ্গে অনন্তের পথে এগিয়ে যাও।

উপরে যে সকল কথা বলে এসেছি, তা থেকে এইটুকু অন্তত বুঝেছ আশা করি যে, ঈশ্বরকে পেতে গেলে, নিরানন্দ দূর করতে গেলে, ভগবানের আনন্দস্বরূপ বুঝতে গেলে ছয়টা রিপুরই বাঁধ ভেঙ্গে দিতে হবে; কি উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া, কি স্বরচিত, উভয় প্রকারের সীমাগুলি নির্মূল করতে হবে। ঈশ্বরপ্রদত্ত সীমাগুলির নিকটে যে বাধা পাওয়া যায়, সে বাধা আমাদিগকে অনন্তেরই পথে অগ্রসর করে দেয়।

ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ, একথা আমরা যখন জানতে পেরেছি, তখন আর কেন আমাদের হৃদয়ে কোন প্রকার দুঃখশোক নিরানন্দ আসতে দেব? ঋষিদের সঙ্গে আমরাও এক-

রসোবৈ সঃ

প্রাণ হয়ে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করব যে সেই অভয়দাতা পরমেশ্বরের আনন্দ যিনি জেনেছেন তিনি কখনও ভয় পান না এবং কেহই তাঁকে ভয় দেখাতে পারে না, নিরানন্দ তাঁর কাছ থেকে দূরে পলায়ন করে। তোমাদের প্রতি আমার এই উপদেশ যে তোমরা সেই অনন্ত আনন্দ পরমেশ্বরকে

কখনো ছেড়োনা না; তাঁকে প্রাণের একমাত্র আরাম, জীবনের একমাত্র বন্ধু জেনে হৃদয়ে বেঁধে রাখ এবং ঋষিদের সঙ্গে সমস্বরে বেদমন্ত্রে বল যে তিনি রসস্বরূপ—রসোবৈ সঃ।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত শ্রীভগবৎকথায়
ঈশ্বর আনন্দরূপ নামক চতুর্থ কথা সমাপ্ত।

—ঃওঁঃ—

পঞ্চম কথা—ঈশ্বর অমৃত (অমৃতং যদ্বিভাতি)।

ঈশ্বর অমৃত। তিনি মৃত্যুর অতীত, মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। যার জন্ম আছে তারই মৃত্যু আছে; যার জন্ম নেই তার মৃত্যুও নেই। ঈশ্বর অনন্ত। তাঁর যখন আদি নেই, অন্ত নেই, তখন তাঁর জন্মই বা কি করে সম্ভব হয়, আর তাঁর মৃত্যুই বা কি করে হয়? ঈশ্বর নিজের অনন্ত প্রকৃতির ছায়া যে দুইটী জিনিসে বিশেষ ভাবে রেখে দিয়েছেন, সেই দুইটী জিনিসেই এই সত্যের বিশেষ পরিচয় পাই যে যার জন্ম নেই তার মৃত্যুও নেই। সেই দুইটী জিনিস স্থান ও কাল। এই যে অসীম স্থান পড়ে আছে, এই স্থানের আদিই বা কোথায় আর অন্তই বা কোথায়? এই যে অসীম কাল পড়ে আছে, এই কালেরই বা আদি কোথায়, অন্তই বা কোথায়? ইহার জন্মই বা কখন্ আর মৃত্যুই বা কখন্?

জন্ম ও মৃত্যু সহচর

আমরা কাকে মৃত্যু বলি? যে প্রাণ আগে ছিল, সেই প্রাণের অভাবকেই তো আমরা সাধারণত মৃত্যু বলি? একটা পিদীম জ্বাললুম, পিদীমটী বাতাসে নিবে গেল। তখন আমরা বলব যে পিদীমটী নিবে গেছে, যদিও ধরতে গেলে পিদীমের আলোটুকুর মৃত্যুই ঘটল। কিন্তু যদি কোন প্রাণী, সে প্রাণী অণুবীক্ষণদৃশ্য জীবাণু অবধি মনুষ্য পর্য্যন্ত যে কোন প্রাণীই হোক না কেন, প্রাণত্যাগ করে, তাহলে আমরা

প্রাণের অভাবকেই সচরাচর মৃত্যু বলি

বলব যে সেই প্রাণী মরে গেছে। একটা পাথরকে ভেঙ্গে ফেল্লুম, কেহই বলবে না যে পাথরটা মরে গেছে। কিন্তু একটা গাছ কেটে ফেল্লুম। যদি সেই কাটা গাছ থেকে কোন পাতা ফুল না বেরোয়, তাহলে বলব যে গাছটা মরে গেছে, তার প্রাণের অভাব হয়েছে। আর যদি সেই কাটা গাছ থেকে ফুল পাতা বেরোয়, তবে বলব যে গাছটা তখনও বেঁচে আছে। তবেই দেখা যাচ্ছে যে প্রাণের অভাবকেই আমরা সাধারণত মৃত্যু বলি।

প্রাণ কি ?

জগতে আমরা যে প্রাণের খেলা দেখতে পাই, মৃত্যু বা অন্ত কোন অবস্থাতে সেই প্রাণের অভাব হয় কি না ? প্রাণটা কি ? প্রাণ এক প্রকার শক্তি। এই শক্তি দ্বারা প্রাণী মাত্রই আহার সংগ্রহ করে, আহার পরিপাক করে, খেলা করে, ফল প্রভৃতি নূতন প্রাণের জন্মদান করে।

শক্তির বিনাশ নাই

এখন বড় বড় পণ্ডিতেরা একেবারে নিশ্চয়রূপে ঠিক করে-ছেন যে কোন শক্তিরই বিনাশ নাই অর্থাৎ কোন শক্তিই একেবারে মরতে পারে না। শক্তির পরিবর্ত্তন হতে পারে, অর্থাৎ এক শক্তি নিজের আকার ও স্বভাব ছেড়ে অন্য আকার ও স্বভাব গ্রহণ করতে পারে। ধর যেন তুমি দশমাত্রা বিদ্যুৎ শক্তি একটা শিশিতে বন্ধ করে রেখেছ। কয়লা বা অন্য কোন জিনিস, যে জিনিসে আগুন দিলে পুড়ে যায়, এমন জিনিসে সেই দশমাত্রা বিদ্যুৎ ছেড়ে দিলে। তার ফলে সেই জিনিসটা জলে উঠল এবং তা থেকে হয়তো একশত মাত্রা উত্তাপ পাওয়া গেল। তাহলে হল এই যে দশমাত্রা

বিদ্যুৎ একেবারে মরল না, কিন্তু নিজের আকার ও স্বভাব ছেড়ে দিয়ে একশত মাত্রা উত্তাপের আকার ও স্বভাব গ্রহণ করল। তোমার মাংসপেশীর যে শক্তি আছে, যখন কোন জিনিস ওঠাও, তখন সেই মাংসপেশীর শক্তি জিনিস ওঠাবার শক্তির বিশেষ আকার গ্রহণ করে মাত্র। বড় বড় পণ্ডিতেরা যে সকল সূক্ষ্ম গণনা দ্বারা এই সিদ্ধান্ত ঠিক করেছেন, সেই সকল গণনা তোমাদিগকে বুঝিয়ে দেওয়া বড় শক্ত, একরকম অসম্ভব। তাঁদের একটা প্রধান কথা এই যে কোন শক্তির যদি সম্পূর্ণ বিনাশ সম্ভব হত, তাহলে তাঁরা কোন শক্তিরই কার্য্য সম্বন্ধীয় গণনা করতে পারতেন কি না সন্দেহ।

প্রাণের বিনাশ নাই

উপরে আমরা যে কথা বলে এলুম, তা থেকে এইটুকু পাচ্ছি যে প্রাণ একপ্রকার শক্তি এবং প্রাণের সত্যসত্যই বিনাশ বা মৃত্যু নেই।

এই প্রাণ কোথা থেকে এল? জলে স্থলে আকাশে সকল স্থানেই দেখি যে প্রাণ ছড়িয়ে আছে। এত প্রাণ কোথা থেকে আসে?

প্রাণের উৎপত্তি মহাপ্রাণ

একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার এই দেখি যে সকল প্রাণীরই প্রাণন কার্য্যের প্রণালী মূলে এক। আমি প্রাণ ধারণ করতে ইচ্ছা করলে আমার বায়ু জল প্রভৃতি নানা উপকরণ ও উপায়ের সাহায্য নিতে হবে, আমাকে খেতে হবে, নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলতে হবে। অন্যান্য ছোট বড় জীবজন্তুকেও বাঁচতে গেলে সেই একই উপায়ে বাঁচতে হবে। আবার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণুকেও সেই একই উপায়ে

বাঁচতে হবে। এমন কি, গাছপালা পর্য্যন্ত তাদের উপযুক্ত আহার মাটী জল, নিশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য বাতাস, উত্তাপ প্রভৃতি না পেলে বাঁচতেই পারে না। এই যে জীবজন্তু কীটপতঙ্গ গাছপালা প্রভৃতি প্রাণবিশিষ্ট সকল বস্তুরই মধ্যে প্রাণন কার্য্যের একটী প্রণালীই কাজ করছে, প্রাণের একটা মূল কারণ না থাকলে কি এই রকম একই নিয়ম সর্ব্বত্র সুন্দর রূপে কাজ করতে পারত? এই প্রাণের মূল কারণ সেই অদ্বিতীয় মহাপ্রাণ পরমেশ্বর বলেই একই প্রণালী একই নিয়ম সকলেরই ভিতর কাজ করছে।

মহাপ্রাণ মৃত্যুর অতীত

আমরা দেখে এসেছি যে প্রাণের বিনাশ বা মৃত্যু নেই। যে মহাপ্রাণ থেকে সেই প্রাণ এসেছে, সেই মহাপ্রাণ যে সকল রকমে মৃত্যুর অতীত, সে কথা বোধ হয় দুবার করে বলে দিতে হবে না। সেই মহা-প্রাণকে মৃত্যু স্পর্শ করতে পারলে জগতে প্রাণের কাজ কি চলতে পারত? তোমার একটী ঘড়ী আছে। তুমি বেঁচে আছ, ঘড়ীতে দম দাও, তাই ঘড়ীটী নিয়মিত চলে। তুমি মরে গেলে যদি আর কেহ সেই ঘড়ীতে দম না দেয় তাহলে ঘড়ীটী আর চলবে না। সেই রকম মহাপ্রাণের অভাব হলে প্রাণ থাকবে কি রূপে?

শূন্য থেকে প্রাণ আসেনি

প্রাণ যে আপনাপনি আসে নি, কিন্তু সেই মহাপ্রাণ থেকে এসেছে, একটী কথা ভেবে দেখলে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। তোমরা পড়েছ যে শূন্যকে (০) কোন সংখ্যা দিয়ে

গুণ করলে বা ভাগ করলে গুণফল বা ভাগফল শূন্যই হয়। ইহার অর্থ এই যে, যদি কোন জিনিস না থাকে, তবে সেই শূন্য থেকে কোন জিনিস তৈরি হতে পারে না অথবা সেই শূন্য থেকে কোন কিছু বেরিয়ে আসতেও পারে না। যেখানে প্রাণ নেই অর্থাৎ প্রাণ শূন্য, সেখানে যতই কেন উত্তাপ জল প্রভৃতি দেওয়া হোক, তার ফলে শূন্যই পাওয়া যাবে অর্থাৎ প্রাণের কোনই পরিচয় পাওয়া যাবে না। এই যে আমরা মাংস খাই, মাছ খাই, ডাল-ভাত খাই, এই সকলে যদি প্রাণ না থাকত তাহলে কি আমরা ঐ সকল জিনিস খেয়ে বাঁচতে পারতুম ? এমন দেখা গেছে যে শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বের তোলা ধান উপযুক্ত মাটী জল বাতাস পেয়ে রীতিমত শস্য দান করেছে। তোমরা তো মনে করতে যে সেই ধানটুকু বহুকাল পূর্ব্বেই মরেই গিয়েছিল। কিন্তু তা নয়। তাতে প্রাণ ছিল বলেই তা থেকে আবার শস্যরূপ নূতন প্রাণ বেরোল। ধান যব প্রভৃতির প্রাণ এত কঠোর যে সেগুলিকে খুব সিদ্ধ করলেও তা থেকে প্রাণ সম্পূর্ণ বেরোয় না। তাতে যতটুকু প্রাণ থাকে সেইটুকুই আমাদের প্রাণধারণের উপযুক্ত। তাদের অবশিষ্ট প্রাণ জল প্রভৃতির সঙ্গে অন্য আকার প্রকার ধারণ করে। সেই সকল সিদ্ধ জিনিস আমরা যখন খেয়ে প্রাণ ধারণ করি, তখন তার অর্থ এই যে আমরা সেই সকল জিনিস থেকে আমাদের প্রাণধারণের উপযুক্ত পরিমাণে প্রাণ বাহির করে নিই এবং সেই প্রাণে মাংসপেশীর বল, শরীরের রক্ত প্রভৃতি নানা আকার প্রদান করি এবং তার বাকী অংশ নানা উপায়ে শরীর

থেকে বের করে ফেলি। অন্যান্য জীবজন্তুরা কাঁচা জিনিসই খেয়ে আপনার আপনার শরীর পোষণের উপযুক্ত প্রাণাংশ গ্রহণ করে বাকী অংশ বের করে ফেলে। এই সকল দৃষ্টান্ত থেকেও কতকটা বুঝতে পারবে যে এখানে যে প্রাণ দেখছি, সেই প্রাণের মৃত্যু নেই, কিন্তু তার আকার প্রকারের বদল হতে পারে।

জগতের প্রাণ ঈশ্বরের দান

এখন ভেবে দেখ যে এক সময়ে এই পৃথিবী ছিলই না। সূর্য্য এখন যা আছে, গোড়ায় তার চেয়ে অনেক বড় ছিল। সেই গরম সূর্য্যের এক টুকরো ছিটকে এসে এই পৃথিবীর জন্মদান করল। যে সময়ে এই পৃথিবী সূর্য্য থেকে বেরিয়ে এসেছিল, সেই সময়ে ইহা এত গরম ছিল যে এতে কোন প্রকার প্রাণ জন্মাতেই পারেনি। সেই পৃথিবী ক্রমে ঠাণ্ডা হল, প্রাণ-রক্ষার উপযুক্ত হল এবং ক্রমে তাতে বৃক্ষলতা প্রভৃতি প্রাণের উৎপত্তি হল। এটা কি কখন সম্ভব যে এই প্রাণ আপনাপনি এল? যে প্রাণের খেলা নিয়মে নিয়মে ছন্দে ছন্দে চলছে, সেই প্রাণ কি হঠাৎ আপনাপনি আসতে পারে? আগেই বলে এসেছি যে শূন্য থেকে শূন্যই আসে। সূর্য্যে প্রাণের বীজ না থাকলে পৃথিবীতে প্রাণ আসত কি করে? আর, এই প্রাণের মূল বীজ কি সূর্য্যেই আপনাপনি আসতে পারে? মনে কর যে একটা শ্লেট পাথরে একটা অঙ্ক কষা আছে—তোমরা কি ইহা মনেও করতে পার যে সেই অঙ্কটা আপনাপনি কষা পড়ে আছে, কেহ সেই অঙ্কটা কষে

রাখে নি? সূর্য্যে যে প্রাণের বীজ নিহিত আছে, তাহা নিশ্চয়ই সেই মহাপ্রাণ পরমেশ্বরই সূর্য্যে নিহিত করে দিয়েছেন। যাঁর ইচ্ছাতে প্রাণই এসেছে, প্রাণের উৎপত্তি হয়েছে, তাঁকে মৃত্যু স্পর্শ করলে প্রাণ থাকবে কি করে? তাঁতে পরিবর্ত্তনেরও সম্ভাবনা নেই। তিনি মৃত্যুর অতীত থেকে জগত চরাচরে ওতপ্রোত থেকে প্রাণ ঢেলে দিয়েছেন। এ জগতে খেলা করে যত কিছু প্রাণ, জানি তাহা একই তাঁর সুমঙ্গল দান।

ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ ও মৃত্যুর অতীত

ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ। সুতরাং তিনি মৃত্যুর অতীত। সুখের অভাবেই আমাদের নিরানন্দ আসে। আমি সুখ চাই, সুখ না পেলেই কষ্ট হয় এবং কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে নিরানন্দ আসে। তুমি মায়ের আদর চাও, মায়ের আদর পেলে তোমার সুখ হল, মায়ের আদর না পেলে দুঃখ ও নিরানন্দ এল। কিন্তু এই পৃথিবীতে যত রকম সুখ আছে, তার মধ্যে বেঁচে থাকাই সকল সুখের চরম সুখ, কারণ বেঁচে না থাকলে কোন প্রকার সুখেরই আস্বাদ পাবার সম্ভাবনা নেই। আর, সকল দুঃখের মধ্যে মৃত্যুই চরম দুঃখ, সকল দুঃখের মূলাধার, কারণ মৃত্যুর পর সকল সুখেরই অভাব ঘটবে এই আশঙ্কা। কিন্তু যিনি চিরসত্য এবং চির আনন্দ, তাঁর কাছে মৃত্যু কোথায়? মৃত্যু তাঁকে কি প্রকারে স্পর্শ করবে? তিনি আনন্দময়, তাঁতে নিরানন্দের কণামাত্র পৌঁছিতে পারে না।

ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ, সুতরাং তিনি মৃত্যুর অতীত। তিনি অতীত সমস্ত কাল, বর্ত্তমান কাল এবং ভবিষ্যৎ সমস্ত কাল সম্পূর্ণ

রূপে জানছেন। সূর্য্য থেকে এই পৃথিবীতে যে ভাবে প্রাণ আসবার সম্ভাবনা ছিল; কেবল এই পৃথিবীতে কেন, সমস্ত জগতচরাচরে যেখানে যে প্রাণের খেলা চলছে ও চলবে, তিনি সে সমস্তই জানেন। তিনি সেই প্রত্যেক প্রাণবিন্দুর আদি অন্ত মধ্য সকলই জানছেন। তিনি যদি মৃত্যুর অতীত না হতেন, তাহলে প্রত্যেক প্রাণবিন্দুর ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমান জানতে পারতেন না। তাঁর মৃত্যু হলে তিনি নিশ্চয়ই সেই মৃত্যুর পররর্ত্তী কালের কোন কথাই জানতে পারতেন না।

ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ ও মৃত্যুর অতীত

এস, এইবারে আমরা প্রাণ ভরে বলের সঙ্গে, জগতের অতীতকালের যাঁরা চলে গেছেন, বর্ত্তমানে যাঁরা কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করছেন এবং ভবিষ্যতে যাঁরা ভগবানের জয়কীর্ত্তন করবার জন্য আবির্ভূত হবেন, সকলের সঙ্গে সমস্বরে ঘোষণা করি—ঈশ্বরই অনন্ত সত্য, ঈশ্বরই অনন্ত জ্ঞান এবং ঈশ্বরই অমৃতানন্দ।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত শ্রীভগবৎকথায়
ঈশ্বর অমৃত নামক পঞ্চম কথা সমাপ্ত।

—ঃওঁঃ—

ষষ্ঠ কথা—ঈশ্বর শান্ত ও মঙ্গল (শান্তং শিবং)।

ঈশ্বর শান্ত। তিনি শান্তিসমুদ্র অতি গভীর। অন্তরে বাহিরে তাঁর সেই গভীর শান্ত ভাব ছড়িয়ে আছে, চক্ষু উন্মীলিত করে দেখবার চেষ্টা করলেই সর্ব্বত্র সেই শান্তভাবের পরিচয় পাবে। প্রত্যূষে নদী-কূলে কোন সুপ্রশস্ত বালুচরের উপর বসে থাক। দূরে পল্লীর ভিতর দুএকটী পাখী দুএকবার ঘুমোঘোরে ডেকে উঠে ঘুমিয়ে পড়ল। ক্রমে ধীরে অতি ধীরে প্রাতঃসূর্য্য আপনার প্রশান্ত মূর্ত্তি প্রকাশ করতে করতে উদিত হচ্ছে। সেই সময়ের প্রকৃতির শান্তমূর্ত্তি কেমন সহজেই ঈশ্বরের শান্তভাবের পরিচয় দেয়। গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নকালে সুবিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে একটী বৃক্ষতলে বসে থাক। তোমার সম্মুখে দূরেতে মাঠের সূক্ষ্ম ধূলিরাশি খুব পাতলা ধোঁয়ার মত ক্রমাগত কাঁপতে কাঁপতে আকাশে উঠছে। গরু, মানুষ প্রভৃতি কোন জীবজন্তু মাঠে খেলা করছে না। মানুষেরা হয় ঘরেতে অথবা গাছের তলায় শুয়ে সুখে ঘুমোচ্ছে, গরুগুলো গাছের তলায় শুয়ে জাওর কাটছে। পাখীগুলো গাছের পাতার ছায়াতে বসে দোর্দ্দণ্ড মার্ত্তণ্ডের প্রতাপ থেকে আপনাদিগকে রক্ষা করছে। সেই সময়ে ঈশ্বরের গভীর শান্তভাবের কেমন পরিচয় পাও। সন্ধ্যাকালে কোন পর্ব্বতের উপর নির্জ্জনে বসে থাক। রাত্রির

প্রকৃতির শান্তভাবে ঈশ্বরের প্রশান্তভাবের পরিচয়

ধীরে ধীরে গরুগুলোকে ঘরে নিয়ে যাচ্ছে। পাখীগুলো ক্রমে বাসায় ফিরে এসে দুএকবার ডাকতে ডাকতে ঘুমিয়ে পড়ল। ধীরে অতি নিঃশব্দ পদক্ষেপে সন্ধ্যা জগতের মুখটা আপনার বসনের আঁচল দিয়ে ঢেকে ফেল্ল। সুনীল আকাশে দুএকটী করে তারাগুলি ফুটে উঠতে লাগল। কি গভীর শান্তভাব! শান্তি-সমুদ্রের কি সুন্দর পরিচয়! পূর্ণিমার রাত্রে জোৎস্নাধবলিত আকাশের দিকেই চেয়ে দেখ, অথবা অমানিশার আকাশের অন্ধকারের ভিতরেই প্রবেশ কর, সেই একই গভীর শান্তভাবের পরিচয় পাবে। প্রকৃতির এই শান্তভাব সেই শান্তিসমুদ্রেরই প্রশান্তভাবের ছায়া মাত্র।

শান্ত হৃদয়ে তিনি প্রকাশ পান

ঈশ্বর শান্ত। তাঁকে দেখতে ইচ্ছা করলে শান্ত সমাহিত হয়ে তাঁর দিকে এগোতে হবে। তোমার হৃদয় মন যদি শান্তভাব ধরে, তবে তাতে সহজেই সেই শান্তিসমুদ্রের ছায়া পড়বে। আর, যদি তোমার হৃদয়ে অশান্তি থাকে, তবে বহিঃপ্রকৃতিতে যতই কেন শান্তিবায়ু ভগবৎগাত্র হতে সুগন্ধ আসুক, তা তুমি অনুভব করতেই পারবে না। আমরা যদি নিজেদের মনকে অশান্তিতে ডুবিয়ে রাখি, তবে চারিদিকে কেবল অশান্তিরই বিভীষিকা দেখতে থাকব।

ঈশ্বর মঙ্গল

ঈশ্বর মঙ্গল। তিনি কেবল শান্তভাবে দর্শকের মত দাঁড়িয়ে নেই। তিনি জগতের প্রতি পরমাণুতে, কালের প্রতি মুহূর্ত্তে ওতপ্রোত থেকে নিরন্তর

মঙ্গল সাধন করছেন। যখন সমস্ত প্রাণী ঘুমেতে অচেতন থাকে, তখনও সেই জাগ্রত পুরুষ অনিমেষ নয়নে সকলের মঙ্গল আলোচনা করেন এবং আপনার শান্ত মহিমাতে অবস্থিত থেকে জগতের হিত সাধন করেন।

ঈশ্বর মঙ্গল। তাঁর মঙ্গল ভাবের পরিচয় চারিদিকেই ছড়ান রয়েছে। কোন্ দিকে দেখিয়ে বলব যে এই দিকে তাঁর মঙ্গল-হস্তের পরিচয় পাই, অন্য দিকে পাই নে? মানুষ সৃষ্টির অনেক পূর্ব্বে মানুষের শরীর রক্ষার উপযোগী কয়লা, জল, ফলমূল প্রভৃতির সংস্থান করে দিয়েছেন। আমাদের শরীরের মধ্যে এমন এক ক্ষুধা বৃত্তি ঢুকিয়ে দিলেন যে তারই ফলে আমাদের বুদ্ধি প্রভৃতি মনের বৃত্তিসকল ফুটে উঠল। আবার সেই বুদ্ধির সাহায্যে কাজ করতে করতে আত্মা জাগ্রত হয়ে সেই প্রাণারাম পরমাত্মার দিকে ছুটতে চায়। তাঁর মঙ্গল ভাবের পরিচয় সমস্ত জীবন ধরে লিখলেও শেষ করা যায় না।

ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবের পরিচয়

কবে কোন্ যুগযুগান্তর পরে মানুষেরা রেঁধে খাবে, রেলগাড়ী চালাবে, জাহাজ চালাবে, নানা রকম কলকারখানা চালাবে, তার জন্য দয়াময় পরমেশ্বর কোটী কোটী বৎসর আগে থেকেই পাথুরে কয়লার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তোমরা বোধ হয় পড়েছ যে সেই কোটী কোটী বৎসর পূর্ব্বের গাছগুলোই কয়লা হয়ে গেছে। গাছগুলো জল ও উত্তাপের মধ্যে দমে থেকে একেবারে কালো রং আর শক্ত জমাট বাঁধা হয়ে গেছে। কোটী কোটী বৎসর

পরে আমরা সেই জমাট বাঁধা গাছ ভেঙ্গে অনায়াসে নানা কাজে লাগাতে পারছি।

যে বিশ্বেশ্বর মহাদেব একটা সূর্য্যকে প্রতিষ্ঠিত করে এই পঞ্চভূতাত্মক পৃথিবী সৃষ্টির উপায় করলেন এবং সেই পৃথিবীতে সাড়ে তিন হাতের মানুষ আসবার ব্যবস্থা করলেন; এবং যিনি সেই মানুষকে তাঁকে জানবার অধিকার দিলেন, সেই দেবতা মঙ্গলময় নয় তো আর কোন্ দেবতা মঙ্গলময়? তিনি একটা ধ্রুবতারাকে আকাশে রাখিয়ে দিয়ে জ্যোতির্বিদ্যার কত না উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। দ্যুলোকে দেখ, সেখানেও যেমন তাঁর মঙ্গলহস্ত দেখবে, ভূলোকেও তেমনই তাঁর মঙ্গল হস্ত দেখতে পাবে। কোন্ যুগে হিমালয় পর্ব্বত উঠল, আর আজ আমরা সেই হিমালয় থেকে প্রবাহিত নদীগুলি অবলম্বন করে বেঁচে আছি, জগতের উন্নতি সাধনে নিযুক্ত রয়েছি। এই নদী সকল অবলম্বন করে কতশত পুণ্যযশা ঋষিমুনি আমার সেই প্রাণারামের কথা কীর্ত্তন করে গিয়েছেন এবং সেই পুণ্যকথা সকল আলোচনা করে আজ আমরা আনন্দ অনুভব করছি এবং জীবনকে ধন্য বোধ করছি।

কোন কোন ঘটনায় সময়ে সময়ে ঈশ্বরের শান্ত ও মঙ্গলভাবের উপর কারো কারো সন্দেহ আসে। ভূমিকম্প হল, আমার বাড়ী ঘর পড়ে গেল, আমার স্ত্রী পুত্র মরে গেল। আমি ভাবলুম যে, যে ঈশ্বর এই রকম প্রলয়ের ব্যবস্থা করেছেন, তাঁর শান্ত ভাবই বা কোথায়, আর

ঈশ্বরের মঙ্গলভাবে সন্দেহের কারণ

তাঁর মঙ্গল ভাবই বা কিসের? প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি হল, অনাবৃষ্টি হল, দুর্ভিক্ষ হল, কত লোক অনাহারে মরে গেল, আমরা সেই সমুদয় ঘটনাকে অমঙ্গল বলে উল্লেখ করি।

আপাতত অমঙ্গল ঘটনায় মঙ্গলভাবের পরিচয়

এই সকল ঘটনা আমাদের চোখে আপাতত অমঙ্গল বলে বোধ হলেও এগুলি যে তাঁরই মঙ্গল হস্তের পরিচয় তাতে সন্দেহ নেই। ভেবে দেখ যে সেই কোটী কোটী বৎসর পূর্ব্বে কত গাছপালা হয়েছিল। তারপর সেগুলি জলে ডুবে পাথুরে কয়লা হল এবং সেই কয়লা দিয়ে আমরা আজ কত না কাজ করছি। এখন সেই গাছপালাগুলি যদি বলে যে তাহাদিগকে জলে ডুবিয়ে কয়লা করা ঈশ্বরের অমঙ্গল ভাবেরই পরিচয়, তাহলে সে কথায় তোমরা কি হেসে উঠবে না? তোমরা যে কেরোসিন তেল ব্যবহার কর, সেটা কি জান? আজকাল এক রকম স্থিরই হয়েছে যে কোটী কোটী বৎসর পূর্ব্বে যে জানোয়ারগুলো জলে ডুবে গিয়েছিল, তাদের চর্ব্বি উত্তাপ ও জলের দমে পড়ে তেলের আকার ধরেছে। সেই জানোয়ারগুলো যদি বলে যে তাদের জলে ডুবে যাওয়া ঈশ্বরের অমঙ্গল ভাবের পরিচয় তাহলে তোমাদের হাসি পাবে না কি? তোমরা আজ কোটী কোটী বৎসর পরে ঈশ্বরের মহিমা অনুভব করে সেই সকল ঘটনায় তাঁরই মঙ্গল হস্তের পরিচয় পাওয়া যায় বলে আনন্দিত হচ্ছ। সেই রকম আজ আমরা আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু প্রভৃতি যে সকল ঘটনাকে অমঙ্গল মনে করে মুহ্যমান হচ্ছি, হয়তো কোটী কোটী বৎসর পরে যে উন্নত মানব

সংসারে বিচরণ করবে, সেই উন্নত মানব সেই সকল ঘটনার মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গল ভাব অনুভব করে তাঁরই জয়জয়কার করবে।

আমরা দেখে এসেছি যে ঈশ্বর সত্যস্বরূপ, জ্ঞানরূপ, অনন্তস্বরূপ এবং আনন্দময়। এটা কি সম্ভব যে তিনি সমস্তই জেনে শুনে অমঙ্গল পাঠিয়েছেন? যদিই তিনি অমঙ্গল পাঠান তবে আমাদের নিস্তার কোথায়? আমরা মৃত্যুকেই সকলের চেয়ে অমঙ্গল বলে মনে করি। কিন্তু মৃত্যু কি সত্যই অমঙ্গল? মনে কর যে পৃথিবীতে মৃত্যু নেই। তাহলে মানুষেরা চরম বৃদ্ধত্ব লাভ করলে দাঁড়াবে কোথায়? খেতে পারে না, কাজ করতে পারে না, অথচ বেঁচে থাকতে হবে—সে রকম বেঁচে থাকা কি ভয়ানক! এই জন্য বৃদ্ধেরা নিজেই প্রাণভরে প্রার্থনা করে যে তারা যেন ইহলোক থেকে শীঘ্র শীঘ্র সরে যায়। সংসারে মৃত্যু না থাকলে হয়ত সকলেই বলত যে ঈশ্বর কি রকম নিষ্ঠুর যে এই রকম কষ্টের মধ্যে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখেন! যদি বল যে মানুষ বুড়ো না হয়ে বরাবর বেঁচে থাক্। তার ফল কি, একবার কি ভেবে দেখেছ? ভেবে দেখ যে প্রত্যেক মানুষ অনন্তকাল ধরে একই স্থানে খেটে চলেছে, কোন বিশ্রাম নেই; তার এখানে যা কিছু জানবার ছিল সব জেনে গেছে। তার পর সে কি করবে? এখনই যদি আমরা কোন বিষয় কিছু কাল ধরে দেখি, কোন জিনিস কিছু কাল ধরে খাই বা ব্যবহার করি, তা হলে আমাদের তাতে অরুচি হয়। আর অনন্ত কাল ধরে একই জিনিস ব্যবহার করলে, একই বিষয় নিয়ে থাকলে যে কি কষ্ট হত তা বলা যায় না।

মৃত্যু অমঙ্গল নহে

আগে দেখে এসেছি যে ঈশ্বরের রাজ্যে একই নিয়ম সকল স্থানেই কাজ করে। তুমি কেবল মানুষকে প্রাণের একটী বিশেষ নিয়মে বাঁধলে চলবে না। যদি মৃত্যু উঠিয়ে দিতে চাও, তবে সমস্ত প্রাণরাজ্য থেকে তাকে তাড়াতে হবে। সমস্ত প্রাণরাজ্য থেকে যদি মৃত্যু চলে যেত, তাহলে ভেবে দেখ যে একই গাছ, একই ফল, একই জীবজন্তু, সকলেই বুড়ো থুবথুরে হয়ে বিচরণ করছে, অথচ তাদের মৃত্যু নেই। কি ভয়ানক অবস্থা! তাহলে কোন প্রকার ফলমূল কিম্বা কোন জিনিস খাওয়াই চলত না।

যদি বল যে অল্প বয়সে মৃত্যু প্রভৃতিই অমঙ্গল? একথা ঠিক যে আমরা সকল সময়ে বুঝতে পারি নে যে অমুক লোক জগতের খুব ভাল কাজ করছিল, তার অল্প বয়সে হঠাৎ মৃত্যু হল কেন। কিন্তু তাই বলে তার জন্য ঈশ্বরের মঙ্গলভাবে সন্দেহ করা উচিত নয়। আমাদের জানা উচিত যে মঙ্গলময় যখন মৃত্যু পাঠিয়েছেন, তখন তাতে নিশ্চয়ই মঙ্গল। আগেই বলে এসেছি যে একই নিয়ম প্রাণরাজ্যের সর্ব্বত্র কাজ করবে। ফলের দৃষ্টান্ত ধরেই দেখা যাক। অল্পবয়সে মৃত্যু থাকবে না কারণ সেটা অমঙ্গল এই নিয়ম কাজ করলে কাঁচা ফল পেড়ে খাওয়া অসম্ভব হত। কাঁচা ফল খাওয়া সময়ে সময়ে শরীর রক্ষার জন্য দরকার হয়। যদি কাঁচা ফল খেতে না পাওয়া যেত তাহলে কি অবস্থা হত একবার ভেবে দেখ। মনে কর যে তুমি একটী কাঁচা পেপে পেড়ে খেলে। তোমার শরীর ভাল হল, তুমি সংসারের কাজে ভাল করে মন দিতে পারলে। তুমি ভাবলে যে ভাল

কাজ করেছ, তোমার আত্মীয়েরাও তাই ভাবল। কিন্তু পেপে গাছটী কি ভাবতে পারে না যে তার কি সর্ব্বনাশ হল—তার একটী কাঁচা ফল চলে গেল? পেপে গাছটীর অবশ্য কাঁদবার অধিকার আছে। সেই রকম তোমার আমার আত্মীয়ের মৃত্যুতে আমাদের কাঁদবার অধিকার আছে, কিন্তু সেই আত্মীয় যেখানে কাজের জন্য অন্য আকারে উপস্থিত হবেন, সেখানকার লোকদের আনন্দ করবারও অধিকার আছে।

আমরা আগে দেখে এসেছি যে মৃত্যুর অর্থে বিনাশ নয়, কিন্তু শক্তি ও অবস্থার রূপান্তর মাত্র। তাহলে এটুকু আমরা মৃত্যুর অর্থ লোকান্তরে ধরতে পারি যে ইহলোকে যার মৃত্যু হল, উদয় তার বিনাশ হল না, কিন্তু লোকান্তরে সেই ব্যক্তি অন্য আকার ধারণ করে জন্মগ্রহণ করবে। ফল প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য যেমন অন্যান্য জীবজন্তুর ভিতরে প্রবেশ করে আপনার অবস্থার পরিবর্ত্তন করে উন্নত জীবেরা সেইরূপ করবে না, কারণ তারা ক্রমে ক্রমে নিজেদের ব্যক্তিগত বিশেষত্ব পেয়ে গেছে। আমরা জানি যে সূর্য্যচন্দ্র পৃথিবীর এক দিকে অদৃশ্য হয়ে গেলে অন্য দিকে উঠতে থাকে—এক দিকের পক্ষে তাদের একপ্রকার মৃত্যু ঘটলেও অন্য দিকের পক্ষে তারা নূতন জন্মগ্রহণ করল। এ থেকে ঈশ্বর যেন দেখিয়ে দিচ্ছেন যে মৃত্যু আর কিছুই নয়—কেবল একস্থান থেকে চলে গিয়ে আর এক স্থানে উদয়। যদি এই সূর্য্য চন্দ্র অনন্তকাল একই দিকে থাকত, তাহলে ভেবে দেখ যে কি কষ্টই হত!

এইবারে কবির সঙ্গে হৃদয়তন্ত্রীতে ঝঙ্কার দিয়ে গাও—মঙ্গল তোমার নাম, মঙ্গল তোমার ধাম, মঙ্গল তোমার কার্য্য, তুমি মঙ্গল নিদান।

মঙ্গল তোমার নাম

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত শ্রীভগবৎকথায় ঈশ্বর শান্ত ও মঙ্গল বিষয়ক ষষ্ঠ কথা সমাপ্ত।

—ঃওঁঃ—

সপ্তম কথা—ঈশ্বর অদ্বিতীয় (অদ্বৈতং)।

ঈশ্বর অদ্বিতীয়। তিনি দ্বৈতরহিত। তাঁর দ্বিতীয় বা সমান কেহ নেই। জগতচরাচরের প্রত্যেক অণু পরমাণুতে তিনি ওতপ্রোত হয়ে আছেন। সুতরাং সে ভাবে অন্য কারো জগতচরাচরে ওতপ্রোত হয়ে থাকবার অবকাশই নেই। তোমরা পড়েছ যে দুইটী বৃত্ত আলাদা আলাদা স্থান অধিকার করলে তাদের মধ্যে একটী বড় এবং একটী ছোট হবেই; কিন্তু যদি সেই দুটী বৃত্ত সমান স্থান অধিকার করে, তাহলে তারা উভয়েই এক ও অভিন্ন হবে। যদি অন্য কেহ অনন্ত জগতের একটী অণুও বাদ দিয়ে বাকী অংশে ওতপ্রোত থাকেন তবে তিনি আমাদের ঈশ্বরের চেয়ে ছোট হবেন, কারণ আমাদের ঈশ্বর জগতের একটী অণুও বাদ না দিয়ে ওত-প্রোত আছেন। আর তাঁর চেয়ে বেশী করে কেহই জগতে ওতপ্রোত থাকতে পারেন না, কারণ তিনি অনন্ত জগতে অনন্ত কাল ধরে ওতপ্রোত আছেন—এমন একটীও স্থান নেই যেখানে তিনি নেই এবং এমন একটী মুহূর্ত্তও নেই যখন তিনি নেই বা ছিলেন না বা থাকবেন না। আমরা আগে বলে এসেছি যে তিনি আছেন তাই স্থান আছে, তিনিই এই অনন্ত স্থানের স্রষ্টা। এই অনন্ত স্থান একই, ইহার দ্বিতীয় নেই। আমরা খণ্ড খণ্ড স্থান বা আকাশ কল্পনা করে নিলেও স্থান একই। সুতরাং

ঈশ্বর অদ্বিতীয়—স্থানে

সেই স্থানের স্রষ্টা—যাঁর দৃষ্টিতে সেই বিরাট স্থানের অস্তিত্ব, তিনিও কাজেই অদ্বিতীয়। সকল জিনিসে যে ভাবে তাপশক্তি বা বিদ্যুৎশক্তি ওতপ্রোত হয়ে থাকে, সেই ভাব থেকে আমরা জগতে ঈশ্বরের ওতপ্রোত থাকবার কতকটা আভাস পাই।

ঈশ্বর অদ্বিতীয়— কালে

ঈশ্বর অদ্বিতীয়। তিনি যেমন স্থানে অদ্বিতীয়, সেই রকম তিনি কালেতেও অদ্বিতীয়। অনাদি অনন্ত কাল ব্যাপ্ত করে একই পুরুষ থাকতে পারেন, অন্য কারো সে ভাবে থাকবার অবকাশই নেই। যদি অন্য কেহ একটীও মুহূর্ত্ত বাদ দিয়ে অনাদ্যনন্ত কালের বাকী অংশে ওতপ্রোত থাকতেন, তাহলে তিনি আমাদের ঈশ্বরের চেয়ে ছোট হতেন, কারণ আমাদের ঈশ্বর কালের একটী মুহূর্ত্তও বাদ না দিয়ে আছেন। কাজেই তাঁর চেয়ে বেশী করেও কেহ কালকে ব্যাপ্ত করে থাকতে পারেন না। তিনি আছেন তাই কাল আছে। তিনিই এই অনন্ত কালের স্রষ্টা। আমরা খণ্ড খণ্ড কাল কল্পনা করে নিলেও, কালকে ঘণ্টা দিন প্রভৃতিতে ভাগ করে নিলেও কাল একই। সুতরাং সেই কালের স্রষ্টা—যাঁর দৃষ্টিতে সেই বিরাট কালের অস্তিত্ব—তিনিও কাজেই অদ্বিতীয়।

ঈশ্বর অদ্বিতীয়— জ্ঞানে

ঈশ্বর অদ্বিতীয়। আমরা আগে দেখে এসেছি যে সেই পরমেশ্বর সকল স্থানের প্রতি অণু পরমাণুর এবং সকল কালের প্রতি মুহূর্ত্তের প্রতি ঘটনা জানছেন। যখন সেই স্থান ও কাল অদ্বিতীয়, তখন কাজেই

ঈশ্বর জ্ঞানেতেও অদ্বিতীয়। স্থান ও কালের যখন স্রষ্টাই তিনি, তখন একথা বলা যেতেই পারে না যে স্থান ও কালের এতটুকুও অংশ তাঁর জ্ঞানকে অতিক্রম করতে পারে। যখন কোন কিছুই তাঁর জ্ঞানকে অতিক্রম করতে পারে না, তখন তাঁকে অতিক্রম করে আর কিছুই জানবার বিষয় নেই। তাঁকে অতিক্রম করে কোন কিছু জানবার বিষয় থাকলে সেই বিষয়টুকু তাঁর জ্ঞানের অতিরিক্ত থাকত—কিন্তু সেটা একেবারেই অসম্ভব।

ঈশ্বর অদ্বিতীয়—আনন্দে

ঈশ্বর অদ্বিতীয়। তিনি আনন্দে অদ্বিতীয়। আমরা দেখে এসেছি যে তিনি আনন্দরূপ। তাঁতে নিরানন্দের কণামাত্রও থাকতে পারে না। আমাদের স্বরচিত প্রভৃতি সীমার কারণেই আমাদের আনন্দে বাধা আসে। কিন্তু ঈশ্বর যখন অনন্ত, তাঁতে যখন কোন রকমেরই সীমার সম্ভাবনা নেই, তখন তাঁতে নিরানন্দ আসবারও কোন সম্ভাবনা নেই। তিনি অখণ্ড বিরাট আনন্দরূপ।

ঈশ্বর অদ্বিতীয়—শান্তভাবে

ঈশ্বর শান্তভাবে অদ্বিতীয়। যখন তিনি আনন্দে অদ্বিতীয়, যখন তাঁতে বিন্দুমাত্র নিরানন্দ আসবার সম্ভাবনা নেই, তখন তাঁতে অশান্তি আসবারও কোন কারণ নেই। নিরানন্দ এলেই অশান্তি আসতে পারে এবং অশান্তি এলেই নিরানন্দ আসতে পারে। তিনি শান্ত—শান্তিসমুদ্র অতি গভীর।

ঈশ্বর অনন্ত সুতরাং অদ্বিতীয়। তাঁর কেহ দ্বিতীয় থাকলে

ঈশ্বর অনন্ত সুতরাং অদ্বিতীয়

তিনি সীমাবদ্ধ হতেন—সেই দ্বিতীয় পুরুষই তাঁর সীমা হতেন—সুতরাং তিনি অনন্ত হতে পারতেন না।

ঈশ্বর অনন্ত এবং অদ্বিতীয় বলেই তিনি অপ্রতিম। তাঁর প্রতিমা অথবা মূর্ত্তি হতে পারে কি না, এই বিষয়ে অনেক তর্ক হয়ে গেছে এবং অনেক তর্ক চলবেও। আমাদের সে সকল তর্কে নামবার কোনই প্রয়োজন নেই, কিন্তু সহজ জ্ঞানে কি জানতে পারি সেইটুকু বুঝে নেব। ঈশ্বর যদি অনন্ত ও অদ্বিতীয় হলেন, তখন কোন্ জিনিসকে তাঁর প্রতিমা বলে উল্লেখ করব? যে জিনিসকে প্রতিমা বলব তাই তো সান্ত হবে, অনন্ত তো হতেই পারবে না, তখন সেই জিনিসকে সেই অনন্ত পুরুষের প্রতিমা বলব কি করে? যখন তাঁর প্রতিমা হতে পারে না, তখন কোন মানুষ বা অন্য কিছু তাঁর পূর্ণাবতারও হতে পারে না। কেহ পূর্ণ অবতার হলেই তো তাঁকে অনন্ত হতে হবে, কিন্তু জগতের সকল বস্তু, সকল জীবজন্তুই সান্ত। ঋষিরা স্পষ্ট বলে গেছেন যে তাঁর প্রতিমা নাই "ন তস্য প্রতিমা অস্তি।"

তাঁর প্রতিমা হতে পারে না বলে কি আমরা তাঁর পূজা করতে পারব না? তা নয়। প্রকৃতিতে তাঁর যে মহিমা ছড়িয়ে আছে, ভারতের ঋষিদের মত ভগবদ্ভক্ত লোকেরা ঈশ্বরবিষয়ে যে সকল

তাঁকে কিরূপে পূজা করব?

মিষ্ট কথা বলে গেছেন, সেই মহিমা, ঋষি-বাক্য প্রভৃতি অবলম্বন করে তাঁর পূজা করব এবং জীবনকে সার্থক করব। ঈশ্বরকে কেমন করে পূজা করব

বলে ভয় পেওনা। তিনি আমাদের পিতা মাতা বন্ধু, সকলই তিনি; তিনি তোমাদের এই যে সঙ্গেই আছেন। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে, জীবনের প্রত্যেক ঘটনায়, সকল স্থানে, সকল অবস্থায় তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন জেনো। তাঁকে হৃদয়ে দেখে, তাঁকে তোমাদের জীবনসঙ্গী জেনে সকল কাজ করলে দেখবে যে তোমাদের দুঃখদারিদ্র্য, কষ্ট নিরানন্দ সকলই দূর হয়ে যাবে।

আমার ইচ্ছা হয় যে ঈশ্বরের বিষয় তোমাদিগকে অবিশ্রামে বলতে থাকি, কিন্তু আমার ক্ষমতায় তা কুলোবে না। তাই ক্ষণেকের জন্য আমার ভগবৎকথার স্রোতকে এইখানে রুদ্ধ করলুম। তোমরা আমার কথাগুলি বেশ করে বুঝে একপ্রাণে সমস্বরে কোটী কণ্ঠে ভগবানের জয়োচ্চারণ করে এই ঋষি-মন্ত্রটীকে কৌস্তুভমণির মত হৃদয়ে ধারণ কর—

ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি
শান্তং শিবমদ্বৈতং।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত শ্রীভগবৎকথায়
ঈশ্বর অদ্বিতীয় বিষয়ক সপ্তম কথা সমাপ্ত।

অথ শ্রীভগবৎকথা সমাপ্ত।

—ঃওঁ তৎসৎঃ—